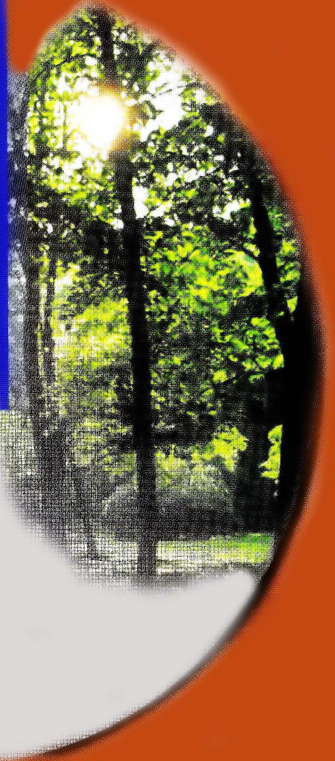


বিএবিডি ও বইঘর নিবেদন

থার্ড পন্ডিত



শফীউদ্দীন সরদার

থার্ডপণ্ডিত

www.boighar.com

শফীউদ্দিন সরদার

www.boighar.com

মদীনা পাবলিকেশন্স

www.boighar.com

৩৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০

শাখা অফিস : ৫৫/বি পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

BOIGHAR.COM

Please Give Us Some
Credit When You Share
Our Books!

Don't Remove
This Page!

EXCLUSIVE

বই

স্ক্যান

ক্রেডিট



খবর

Visit Us at
boighar.com

If You Don't Give Us
Any Credits, Soon There'll
Nothing Left To Be Shared!

প্রকাশনায় :
www.boighar.com
মদীনা পাবলিকেশন্স-এর পক্ষে
মোস্তুফা মঈনউদ্দীন খান
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৭১১৪৫৫৫, ৭১১৯২৩৫

www.boighar.com
প্রথম প্রকাশ :
জিলহজ্জ, ১৪২৪ হিজরী
ফাল্গুন, ১৪১০ বাংলা
ফেব্রুয়ারী, ২০০৪ ইংরেজী
www.boighar.com
(সর্বস্বত্ব লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত)
কম্পিউটার কম্পোজ :

কম্পিউটারঃ ইভা কম্পিউটার্স এন্ড গ্রাফিক্স
ফোন : ৭৩৯১৯৬১

www.boighar.com
মুদ্রণ ও বাঁধাই :
মদীনা প্রিন্টার্স
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ৮০.০০ (আশি) টাকা মাত্র

www.boighar.com
ISBN 984-8367-45-4

থার্ড পণ্ডিত

শফীউদ্দীন সরদার

কৃতজ্ঞতা

ROKON

SCAN & EDITED BY:

BOIGHAR

WEBSITE:

WWW.BOIGHAR.COM

FACEBOOK:

<https://www.facebook.com/groups/Boighar-বইঘর>

WE ALWAYS ENCOURAGE BUYING
THE ORIGINAL BOOK.

প্রকাশকের কথা

www.boighar.com

বাংলা সাহিত্যে জনাব শফীউদ্দিন সরদার এক নতুন ধারার প্রবর্তন করে সমকালীন সাহিত্য অঙ্গনে পাঠকপ্রিয়তার শীর্ষ স্থানটি অধিকার করেছেন। আমাদের গৌরবময় ইতিহাস ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে তাঁর লেখা ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলো একদিকে যেমন বর্তমান প্রজন্মকে হারানো শিকড়ের সন্ধান দিয়েছে তেমনি প্রেরণা যুগিয়েছে সঠিক পথটি খুঁজে নিতে। তাই শফীউদ্দিন সরদার অতি অল্প সময়েই পাঠকের হৃদয়ে আদর্শ ও অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে স্থান করে নিয়েছেন।

চমৎকার কাহিনী বিন্যাস, সুস্থ সাহিত্যের ধারায় তাঁর লেখা সামাজিক উপন্যাসগুলিও গতিশীল বর্ণনার ফলে পাঠক মহলে অত্যন্ত সুখপাঠ্য হিসেবে আদরণীয় হয়েছে। 'থার্ডপঞ্জিত' উপন্যাসটি সাপ্তাহিক মুসলিমজাহানের ঈদ সংখ্যায় প্রকাশের পরই এটি বই আকারে প্রকাশের জন্য প্রচুর তাগিদ আসে। আমরা পাঠকের আগ্রহের প্রতি সম্মান জানিয়ে একুশে বই মেলা-২০০৪ উপলক্ষে এটি বই আকারে পাঠকের হাতে তুলে দিলাম।

মোস্তুফা মঈনউদ্দীন খান

www.boighar.com

১

গন্তব্যের কাছাকাছি এসে বাসটি খারাপ হয়ে গেল। ড্রাইভার-হেলপার মিলে অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও বাসটি আর চালু করতে পারলো না। এলাকাটা এখনও দুর্গম। নাচোল। ইলামিত্রের নাচোল। এক কালের শুধুই সাঁওতাল অধ্যুষিত স্থান। বৃহত্তর রাজশাহীর প্রত্যন্ত এক এলাকা। বাসস্ট্যান্ডটা এখনো দেড় দুই মাইল দূরে। বাস যেখানে খারাপ হলো সেটা ধু ধু মাঠ। কাছে কোলে কোথাও লোক বসতি নেই। দূর মাঠে দু'একজন কর্মরত কৃষক ছাড়া, কোন লোকজনও নেই বাসটির আশপাশে।

জনৈক যাত্রী হাঁক দিয়ে বললো- কী হলো ড্রাইভার সাহেব?

কপালের ঘাম মুছে বাসচালক বললো, ই বাস আর চালু করা যাবিনে ছার। ছালা ভাঙাচুরা এই রাস্তাডা আমাদের জিন্দেগীতেও ভালো আর হবিনে। উদিগে আবার বুল্লে পরে বুল্বেহিনি বুল্ছে। মামুর বেটারা ছব ছালা মারার তালে আছে ছুধু। ইদিকে কোন ছালার লজর নাই। যাত্রীটা ফের হাঁক দিয়ে বললো-তার মানে?

বাসচালক নির্দিধায় বললো- এইখানেই আপনাদের নামতে হবে ছার। বাসস্ট্যান্ডটা ছামনেই। মাইল ড্যারেক হবে। ছহজেই হাঁইটা যাইতে পারবেন।

সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীদের অনেকে একসাথে বলে উঠলো- ছহজেই হাঁইটা যাবো মানে? আমাদের মালামাল? ছাদের উপরে যে মালামাল আছে, ওগুলোর কী হবে?

বাসস্ট্যান্ড থাইক্যা রিস্কা, ভ্যান, যা পান লিয়া আইসেন ছার। ঐয়ে বাসস্ট্যান্ডটা লিকটেই। কে একজন ব্যঙ্গ করে বললো- লিকটেই? যার নাম- নিশানা দেখা যাচ্ছে না, সেটা লিকটেই?

ছার!

www.boighar.com

ভাড়াটা কে দেবে? ঐ ভ্যান-রিসকা কি বিনা ভাড়ায় আসবে?

কী যে কইছেন? তাই আছে ছাব। ভাড়া তো লাগবেই।

তাহলে সেই ভাড়ার পয়সাটা দয়া করে দাও। অগত্যা ঐ সবই আনি।

ড্রাইভার এবার সন্তুষ্টকণ্ঠে বললো- না ছাব, ছব মহাজনের পয়ছা। ই পয়ছা আমার দিবার উপায় নাই।

তোমার দিবার উপায় নেই?

: না ছাব। মহাজন তাহলে আমাকে ছাইড়া কতা বুলবে না। মারেন কাটেন, যা হয় তাই করেন। আমি তো আর ইচ্ছা কইরা গাহ্‌ড়ী থামাইনি। গাহ্‌ড়ী খারাপ হয়্যা গেছে। ইতে আমার কী দোছ হয়্যাচে, বুলেন?

দোষ হয়নি? এইসব ধ্যাড়ধেড়ে মার্কা গাহ্‌ড়ী চালাও কেন?

ছিঃ দোছ তো আমার লয়, মহাজনের। মহাজনকে এতকরে বুলি, ইছব গাহ্‌ড়ী আর চলবে না, লতুন গাহ্‌ড়ী আনেন। কিন্তুক কে ছুনে কার কতা? মহাজন কানেই লেয় না কতা আমার। যান ছাব যান, সুময় লষ্ট করবেন না।

আবার অনেকেই একসঙ্গে বলে উঠলো— বটে! ভাড়া তো দেবেই না, বোঝা যাচ্ছে। এরপর আমরা রিকশা—ভ্যান ডাকতে যাই আর আমাদের মালামালগুলো চুরি হয়ে যাক। মতলব কী তোমার?

তওবা-তওবা। কসম খায়্যা বুলছি ছাব, একটা মালও হারাবে না। আপনারা ফিরে না আহাতক, আমি আর আমার হেলপার ছব মাল পাহারা দিবো ছব ছুময়।

যাত্রীরা আর ড্রাইভারের সাথে ফালতু আলাপে গেল না। যাদের মালামাল ছিল না, তারা হুড়হুড় করে নেমে পড়লো বাস থেকে এবং গন্তব্যের পথ ধরলো। মাল যাদের ছিল তারাও ড্রাইভারের ওপর পুরোপুরি আস্থা আনতে পারলো না। কিছু লোককে মালামালের পাহারায় রেখে, কিছু লোক বেরিয়ে পড়লো ভ্যান-রিকসার খোঁজে।

ঘণ্টাখানেকের কম সময়ের মধ্যেই চলে এলো রিকশা, ভ্যান, ঠেলাগাড়ি। অতঃপর যে যার মাল নিয়ে রওনা হলো নিজ নিজ পথে।

বাসের মাঝখানের এক সিটে বসেছিল বোরকা পরিহিতা এক তরুণী। তার সাথেও কিছু মালামাল ছিল। তরুণীটির অভিভাবক রিকশার খোঁজে গিয়েছিলেন। তিনি ফিরে এলেন অনেকের পরে। এসেই তিনি হাঁক দিয়ে বললেন— নেমে এসো আম্মাজান। আমি গরুর গাড়ি এনেছি।

মেয়েটি বিস্মিতকণ্ঠে বললো— গরুর গাড়ি। সেকি মামুজান! একটা রিকশা হলেই হতো যেখানে, সেখানে একদম গরুর গাড়ি। আমাদের মালামালতো সামান্য। আপনি বয়সী মানুষ, অতদূরে বয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না বলেই রিকশার কথা বললাম।

বাসের গেটে এসে মামুজান বললেন— রিকশা, ভ্যান— কিছুই পাওয়া গেল না মামণি। গিয়ে দেখি ওগুলো আগেই সব বুক্‌ড। সামনেই এই গরুর গাড়িটা পেলাম। ছইওয়লা, সাজানো গুছানো সুন্দর গরুর গাড়ি। তাই এটাই নিয়ে এলাম।

কিন্তু আস্ত এক-গরুর গাড়ি!

: হ্যাঁ, এ নিয়ে ভাবছো কেন? স্ট্যান্ড থেকে বাড়িতে যাওয়ার জন্য গরুর গাড়ি তো নিতেই হতো একটা। তখন হয়তো এত সুন্দর বিছানাপত্র পাতা কোন গাড়ি নাও পেতে পারতাম। তাই এখনই নিয়ে এলাম এটা।

ও হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাইতো। সেদিক দিয়ে তাহলে ভালই করেছেন।

তুমি নেমে এসো মামণি। আমি মালকয়টা গাড়িতে তুলি —

মামুজান চলে গেলেন গরুর গাড়ির কাছে। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো মেয়েটি। মাথার উপর বাংক থেকে হাত ব্যাগটা নামিয়ে নিলো। তারপর নেমে আসতে গিয়ে সে অলস কৌতুকে একবার পেছনে ফিরে তাকালো। গোটা বাসটা আগাগোড়া একবার দেখে নিতে গেল। আর এতে করেই পড়ে গেল এক ঝামেলায়।

বাসটি তখন পুরোপুরি শূন্য। যে দু'একজন তখনও ছিল, তারাও নেমে গেল একটু আগেই। কোন সিটে কোথাও আর কোন লোক নেই। দেখে নিয়ে চোখ ফেরাতে গিয়েই সে দেখতে পেলো, পেছনের সর্বশেষ সারির একেবারেই এক কোণের এক সিটে মানুষের মতো কি যেন একটা পড়ে আছে হুমড়ি খেয়ে। দেখেই মেয়েটি কৌতূহলী হয়ে উঠলো। এগিয়ে গিয়ে দেখলো, সত্যিই একটা মানুষ সিটের উপর পড়ে আছে উপুড় হয়ে। হাত-পা তার থরথর করে কাঁপছে। সেই সাথে অত্যন্ত ক্ষীণ একটা আর্তনাদ তার মুখ থেকে উৎসারিত হচ্ছে। এমনভাবে আর এমন জায়গায় পড়ে আছে লোকটা যে, বাসভরা যাত্রী নিজ নিজ ব্যস্ততা নিয়ে নেমে যাওয়ার কালে তার ওপর কারো নজরই পড়েনি।

মেয়েটি লক্ষ্য করে দেখলো। উপুড় হয়ে পড়ে থাকার দরুন মুখটা তার ভালভাবে দেখা না গেলেও সে কোন জরাজস্ত বৃদ্ধ লোক নয়। মুখে দাড়ি থাকলেও, বেশ হুস্তুপুস্তু কম বয়সী লোক। হাত-পা'ই শুধু নয়, লোকটার সর্বাঙ্গ সমানে কাঁপছে।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে মেয়েটি লোকটার দিকে চেয়ে রইলো একদৃষ্টে। এই সময় তার মামুজান নিচে থেকে আবার হাঁক দিয়ে বললো— কই, কী হলো আম্মাজান? নেমে এসো জলদি।

মেয়েটির সম্বিত ফিরে এলো। পাল্টা হাঁক দিয়ে সে বললো— একটু এদিকে আসুনতো মামুজান। তাড়াতাড়ি আসুন।

কেন, আবার ওদিকে কেন?

আহ্‌হা, আসুন না জলদি!

তার মামুজানের নাম আহসান আলী মুধা। সৌম্য শান্ত মূর্তির এক প্রৌঢ় লোক। অগত্যা ছুটে এলেন তিনি এবং মেয়েটির ইঙ্গিতে পড়ে থাকা লোকটাকে কিছুক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখলেন। তারপর নিঃশ্বাস ফেলে ভাগ্নি নূসরত জাহান নূরীকে অসহায় কণ্ঠে বললেন— এ দেখে এখন আমরা কী করবো মামণি? সবাই চলে গেল, আমাদের ব্যাগ-ব্যাগেজও গাড়িতে তোলা হয়ে গেছে, এ অবস্থায় আমরা কী করবো?

নূসরাত জাহান নূরী বললো— সে কথাতো ঠিকই। কিন্তু আমরা চলে গেলে এ বেচারি এই তেপান্তরে একাই পড়ে থাকবে। ড্রাইভার-হেলপার-সবাই তো

অনেক আগেই উধাও। পাহারা দিয়ে থাকার কথা বললেও, আদৌ তা থাকেনি। এ বেচারা এইভাবে ধুঁকে ধুঁকে মরে গেলেও কেউ দেখতে পারে না।

নূরীর মামুজান, অর্থাৎ আহসান আলী মৃধা সাহেব বিভ্রান্তকণ্ঠে বললেন- তাও তো ঠিক। কিন্তু-

নূরী বললো- আপনি ওকে একটু বসান তো। ঘটনাটা কি, দেখি আগে।

মৃধা সাহেব তাই করলেন। লোকটাকে টেনে তুলে সোজা করে সিটের উপর বসাতেই লোকটা “আহ্-আহ্” রবে বার দুইয়েক আর্তনাদ করে উঠলো এবং হু হু করে আরো জোরে কাঁপতে লাগলো। এবার দেখা গেল, মুখভর্তি ঘন দাড়ি থাকলেও লোকটা আসলেই একজন বাচ্চা বয়সের মানুষ। একেবারেই এক নওজোয়ান। মৃধা সাহেব তার কপালে হাত দিয়ে দেখলেন, খৈ ফুটছে সেখানে। গায়ে হাত দিয়ে দেখলেন, সারা শরীর পুড়ে যাচ্ছে জুরে। অথচ লোকটার গায়ে শুধু পাতলা পায়জামা-পাঞ্জাবির উপর নামমাত্র একখানা সুতির চাদর। কোলের মধ্যে একটা কাপড়ের ব্যাগ আছে বটে, তবে তার মধ্যে কাপড়-চোপড়ের চেয়ে খাতাপত্রই বেশি। লোকটা একবার এই অবস্থাতেই চোখ মেলে তাকালো। দেখা গেল চোখ দুটো তার রক্ত জবার চেয়েও অধিক লাল। মৃধা সাহেব সেই ফাঁকে প্রশ্ন করলেন- কী হয়েছে আপনার?

কয়েকবার প্রশ্ন করার পর লোকটা ক্ষীণকণ্ঠে বললো- জুর!

আরো কি যেন বলতে গিয়ে আর পারলো না। কয়েকবার চেষ্টা করে কাঁপতে কাঁপতে ফের টলে পড়লো সিটের উপর।

নূরী আর মৃধা সাহেব মহা সমস্যায় পড়ে গেলেন। মুহূর্তখানেক তারা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। শেষে নূরী বললো- আর ভেবে কাজ নেই মামুজান। এ অবস্থায় একে এখানে ফেলে রেখে চলে গেলে, এ মারা যাবে যে কোন সময়। অর্থাৎ লোকটাকে নির্ঘাত মৃত্যুর মুখে ফেলে রেখে চলে যাওয়া হবে- যা আদৌ কোন মানুষের কাজ হবে না।

মৃধা সাহেবও সেই কথাই ভাবছিলেন। বললেন, তাহলে কী করতে চাও?

নূরী বললো- লোকটা শীতে আড়ষ্ট হয়ে গেছে। এই মুহূর্তে প্রয়োজন একে মোটা কাপড়-চোপড় দিয়ে ঢেকে ফেলা। আর কিছু না থাকলেও আমার ব্যাগে একটা কষল আছে বেশ পুরুই। এখনই একে ঐ কষল দিয়ে ঢেকে ফেলা উচিত। এ ছাড়া মাথায় খানিকটা পানিও ঢালা দরকার। চোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, এর শরীরের তামাম রক্ত মাথায় ওঠে এসেছে।

মৃধা সাহেব সায় দিয়ে বললেন- ঠিক ঠিক। ড্রাইভারের সিটের পাশেই পানি দেখলাম আধবালতি। আনি তাহলে?

নূরী বললো- না মামুজান, একে আমাদের ঐ গরুর গাড়িতেই তুলে নিতে হবে। শুধু কষল জড়ালে আর ঐ আধবালতি পানি ঢাললেই হবে না। শিগগির

একে ডাক্তারের কাছেও নিতে হবে। বাসস্ত্যান্ডের পাশেই একটা ডাক্তারখানা আছে।

মৃধা সাহেব ইতস্তত করে বললেন- দরকার তো সেটারও। কিন্তু-

নূরী বললো- কী করবেন মামুজান? আল্লাহ তায়ালা হয়তো আমাদের পরীক্ষা করার জন্যেই এই অবস্থার সম্মুখীন করেছেন। নইলে বাসভর্তি এত লোক ছিল তবু কারো নজরেই এ লোক পড়বে না কেন?

মৃধা সাহেব জোর সমর্থন দিয়ে বললেন- হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই হবে। তুমি দাঁড়াও। আমি গাড়ির গাড়োয়ানটাকে ডেকে আনি। তাগড়া-জোয়ান লোক। ও প্রায় একাই একে নিয়ে গিয়ে গরুর গাড়িতে তুলতে পারবে। এ ছাড়া আমিও তো ধরবোই।

মৃধা সাহেব নেমে এসে কিছু বকশিশের অঙ্গীকারে গাড়োয়ানটাকে রাজি করালেন। এরপর দুইজনে ধরাধরি করে লোকটাকে এনে গরুর গাড়িতে শোয়ালেন। নূসরত জাহান নূরী ব্যাগ থেকে তাড়াতাড়ি কঞ্চলটা বের করে লোকটার গা আগাগোড়া ঢেকে দিলো। মৃধা সাহেব বাসের ঐ আধবালতি পানি এনে আস্তে আস্তে মাথায় ঢাললেন লোকটার। এরপর মৃধা সাহেবের নির্দেশে গাড়োয়ান ছেড়ে দিলো গাড়ি এবং গাড়ি চলতে লাগলো দ্রুতবেগে।

গা-টা ঢেকে দেয়াল আর মাথায় কিছুটা পানি পড়ায় লোকটা খানিকটা আরামবোধ করতে লাগলো। বাসস্ত্যান্ডে এসে উল্লিখিত ডাক্তারখানার বারান্দার সাথে গাড়িটা আড়াআড়িভাবে ভিড়িয়ে দেয়া হলো। মৃধা সাহেবের অনুরোধে ডাক্তার এসে রোগীকে পরীক্ষা করে দেখলেন। জ্বরটা পরীক্ষা করে দেখে বললেন- বাপ্রে এখনো একশ'চারের কাছাকাছি জ্বর। ওষুধ আমি দিচ্ছি। কিন্তু খুব করে পানি দিতে হবে এর মাথায়। www.boighar.com

গাড়ির উপরেই শোয়ানো রইলো লোকটা। তার মাথাটা একটু ফাঁকে টেনে নিয়ে ঐভাবেই শুরু হলো মাথায় পানি দেয়া। বারান্দার নিচেই টিউবওয়েল থাকায় পানির অভাব হলো না। গাড়োয়ানের সাথে মৃধা সাহেব ও নূরী যোগ দিয়ে ঘণ্টাখানেক তাঁরা প্রচুর পানি ঢাললেন লোকটার মাথায়। আরো কিছু কাপড়-চোপড় যোগাড় করে কঞ্চলের উপর দিয়ে জড়িয়ে দিলেন সেগুলো। ডাক্তার সাহেবের দেয়া ওষুধটাও আগেই খাইয়ে দেয়া হয়েছিল। এর ফলে আর আধঘণ্টা পরে লোকটা একটু চোখ মেলে তাকালো। দেখা গেল চোখ তার আগের চেয়ে অনেকখানি কম লাল। ডাক্তার সাহেব আবার এসে পরীক্ষা করলেন জ্বর। এবার তিনি আশ্বস্তকণ্ঠে বললেন- আর ভয় নেই। জ্বর এখন নেমে একশতে এসেছে। এখন একে নিয়ে যেতে পারবেন।

মৃধা সাহেব ইতস্তত করে বললেন- কিন্তু একে নিয়ে যাই কোথায় ডাক্তার সাহেব? আশপাশে কোথাও রোগী রাখার মতো কোন হাসপাতালও নেই। একে

নিয়ে যে এখন কী করি?

ডাক্তার সাহেব বিস্মিতকণ্ঠে বললেন- কী করি কেমন? এ লোক কি আপনাদের কেউ হয় না? কোন আত্মীয়-বান্ধব?

জি না। একেবারেই অপর অচেনা লোক। নামটাও জানিনে।

এরপর ঘটনাটা আগাগোড়া বর্ণনা করলেন মুধা সাহেব।

শুনে ডাক্তার সাহেব বললেন- আজব ব্যাপার! কিন্তু এখনতো লোকটাকে কিছু জিজ্ঞাসা করাও যাবে না।

কেন?

: দেখছেন না, আরাম পেয়ে লোকটা ঘুমিয়ে পড়লো এইমাত্র। এখন এই ঘুমটাই এর ওষুধ। এই ঘুম গভীর হলে জ্বরটা ছেড়ে যাবে আপছে আপ। এই ঘুম এখন ভাঙলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

তাহলে?

: তাহলে আর কি করবেন মুরব্বি। দায়টা যখন নিয়েছেন আপনারা, আর একটু কষ্ট করুন। ধীরে ধীরে গাড়ি চালিয়ে একে আপনাদের বাড়ি-ই নিয়ে যান। আরো কিছু ওষুধ দিয়ে দিচ্ছি, ঘুম ভাঙার পর বার দুইয়েক খাওয়ালে এ একদম পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবে। তখন এর সমুদয় হদিস জেনে নিয়ে যথাস্থানে পাঠিয়ে দেবেন একে।

অগত্যা তাই তাদের করতে হলো। লোকটাকে নিয়ে বাড়ির পথই ধরলেন তারা। বলা বাহুল্য, ফি নিতে না চাইলেও ওষুধের দাম হিসেবে কিছু পয়সা ডাক্তারকে দিতেই হলো তাদের।

২

বাড়িতে পৌঁছুতে রাত হলো অনেকখানি। নূসরত জাহান নূরীদের বাড়ি। নূরীর আব্বা আলহাজ ইসমাইল হোসেন চৌধুরী সাহেব একজন ডাকসাইটে জোতদার। মাঠভর্তি জোতভূঁই, বাড়ি ভর্তি দালান-কোঠা আর প্রচুর তাঁর চাকর-কিষান। চৌধুরী সে সময় বাড়িতে ছিলেন না। গরুর গাড়িটা এসে বাহির আঙ্গিনায় ঢুকতেই চাকরবাকরসহ ছুটে এলেন বাড়ির অন্য লোক। ছইয়ের মধ্যে এক অচেনা রোগীকে শুয়ে থাকতে দেখে তাজ্জব হলেন সকলেই। এত করে শুরু হলো প্রশ্নের পর প্রশ্ন কিন্তু নূসরত জাহান নূরী আমল দিলো না কাউকেই। কারণ, রোগীর আবস্থার ইতোমধ্যেই কিছুটা উন্নতি হলেও, অসমান রাস্তায় গাড়ির ঝাঁকুনিতে ঘুমটা তার আদৌ গভীর হতে পারেনি।

যা ছিল তার জ্বর ছাড়ার পক্ষে একান্তই প্রয়োজন। ফলে সে কেবলই ছটফট করতে লাগলো। তাই দুই-চারটে প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়েই নূরী বিদায় করলো সবাইকে। এরপর চাকরদের ডেকে বৈঠকখানায় অতিসত্বর পৃথক একটা

বিছানা পাতার এবং রোগীকে নিয়ে গিয়ে সেখানে শুইয়ে দেয়ার আদেশ দিলো জরুরি। সঙ্গে সঙ্গে পালিত হলো আদেশ। ক্ষিপ্রহস্তে বিছানা পেতে চাকরেরা রোগীকে নিয়ে গেল সেখানে। নূরীর নির্দেশে তখনই ভেতর থেকে ঈষদোষ্ণ দুধ এলো এক বাটি। এবার হাত লাগালেন মৃধা সাহেব। দুধ এবং ওষুধ পরপর খাইয়ে দিয়ে তখনই আবার রোগীকে শুইয়ে দিলেন তিনি। সবশেষে কয়েকজন চাকরকে পালাক্রমে সারা রাত জেগে রোগীর খেদমত করার দায়িত্ব দেয়ার পর, তবেই অন্দরে প্রবেশ করলেন মামা-ভাগ্নি দুইজন।

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই চাকর-বাকরদের নানারকম প্রশ্ন করতে শুরু করলো আগলুক রোগীটি। সে তখন প্রায় পুরোপুরি সুস্থ। জ্বরটা ছেড়ে গেছে সম্পূর্ণই। রোগীর প্রশ্নে কোনই জবাব না দিতে পেরে চাকরেরা খবর পাঠালো অন্দরে। খবর পেয়ে নূরীসহ বেরিয়ে এলেন তার মামা মৃধা সাহেব ও তার আব্বা আলহাজ ইসমাইল হোসেন চৌধুরী সাহেব। বোরকা ছেড়ে এবার নূরী এলো ওড়নায় মাথা ঢেকে। তারা এসে পৌঁছুলে রোগীটি ব্যস্তকণ্ঠে বলে উঠলো— এ আমি কোথায়? আমি কোথায় আছি এখন?

জবাবে নূরীর মামা আহসান আলী মৃধা সাহেব বললেন— আপনি এখন এখানে। আমার ভগ্নিপতি আলহাজ ইসমাইল হোসেন চৌধুরী সাহেবের বাড়িতে।

রোগী ফের প্রশ্ন করলো— কেন, আমি তাঁর বাড়িতে কেন?

মৃধা সাহেব বললেন— আমরাই এখানে এনেছি। জ্বরে আপনি অজ্ঞান হয়ে বাসের মধ্যে পড়েছিলেন। আমরাই আপনাকে সেখান থেকে তুলে গরুর গাড়িতে করে এখানে এনেছি।

আপনারাই?

নূরীর দিকে ইঙ্গিত করে মৃধা সাহেব বললেন—হ্যাঁ, আমি আর আমার ভগ্নি এই নূসরত জাহান নূরী। আমরাও ঐ বাসেরই যাত্রী ছিলাম। মাঝপথে বাস খারাপ হয়ে গেলে, সবাই বাস থেকে নেমে গেল। শুধু এক কোণে বেহুঁশ হয়ে পড়ে রইলেন আপনি। নামার সময় আমরা আপনাকে দেখতে পেয়ে ফেলে আসতে পারলাম না। বিশেষ করে, আমার এই নূরী আন্মা আপনাকে ঐ অবস্থায় ফেলে আসতে কিছুতেই রাজি হলো না। তাই আপনাকে গরুর গাড়িতে তুলে নিয়ে আগে ডাক্তারের কাছে এলাম, আপনাকে ওষুধ খাওয়ালাম আর মাথায় আপনার পানি ঢাললাম প্রচুর। এরপরেও আপনি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠলেন না দেখে বাধ্য হয়ে আপনাকে আমরা আমাদের বাড়ি নিয়ে এলাম। খেয়াল নেই এসব কিছু আপনার?

রোগীটি চিন্তিতকণ্ঠে বললো—হ্যাঁ-হ্যাঁ, এখন কিছু কিছু খেয়াল করতে পারছি।

জ্বর আপনার ছেড়েছে?

জি-হ্যাঁ, জ্বর আর নেই বলেই মনে হচ্ছে।

এখন সুস্থবোধ করছেন?

জি-জি, অনেকটাই সুস্থবোধ করছি।

নাম কী আপনার?

নাম? আমার নাম আমির রেজা। আহমদ আমির রেজা।

বাড়ি কোথায় আপনার?

জি, বাড়ি আমার ঢাকায়।

ঢাকায়! ঢাকা শহরে?

জি-জি।

এ কথা শুনে উপস্থিত সকলেই বিস্মিত হলেন। এবার নূরীর আব্বা আলহাজ ইসমাইল হোসেন চৌধুরী সাহেব বললেন—সেকি! সুদূর ঢাকা শহর থেকে আপনি এতদূরে দেশের এই শেষ প্রান্তে, বিশেষ করে একদম এই প্রত্যন্ত পল্লীতে! কোথায় যাবেন আপনি?

: এই অঞ্চলের নটিকাবাড়ি নামের এক গাঁয়ে। মানে, সেখানে যে ইদানীং একটা হাইস্কুল হয়েছে, সেই হাইস্কুলে।

আর একদফা উপস্থিত সকলেই বিস্মিত ও নির্বাক হয়ে গেলেন। কৌতূহলী দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন তার দিকে। চৌধুরী সাহেবও বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন—মাথাটা কি ঠিক আছে আপনার?

আগন্তুক লোকটি, অর্থাৎ আহমদ আমির রেজাও বিস্মিতকণ্ঠে বললেন—এ কথা বলছেন কেন?

চৌধুরী সাহেব বললেন—সত্যিই কি নটিকাবাড়ি গাঁয়ে আর সেই হাইস্কুলে যাবেন আপনি?

জি-জি। যাবো তো সেখানেই কিন্তু ঘটনাচক্রে কোন দিকে আর কোথায় এসে পড়েছি, দেখুন।

দম বন্ধ করে চেয়ে রইলেন উপস্থিত সবাই। মনে মনে সবারই এক প্রশ্ন, লোকটা বলে কি! চৌধুরী সাহেব ফের বললেন—তাজ্জব। নটিকাবাড়ি এর আগে কি কখনও এসেছেন আপনি?

জি-না। এই প্রথম আর এই প্রথমবার আসতে গিয়েই নসিবের ফেরে—

চৌধুরী সাহেব মৃদু হেসে বললেন—নসিব আপনাকে ঠিকায়নি। আপনি ঠিক জায়গাতেই এসেছেন।

রেজা মিয়া ফের বিস্মিতকণ্ঠে বললেন— ঠিক জায়গাতে!

হ্যাঁ। এই গাঁয়ের নামই নটিকাবাড়ি।

এবার সশব্দে হেসে উঠলেন উপস্থিত জনতা।

আরো অধিক বিস্মিত হয়ে আমার রেজা বললেন—নটিকাবাড়ি?

হ্যাঁ। হাই স্কুলটা এই গাঁয়েরই দক্ষিণ মাথায় মাঠের দিকে আর বাজারের ধারে। এখান থেকে মিনিট দশকের পথ।

আনন্দে ও বিস্ময়ে রেজা মিয়া পলকখানেক নির্বাক হয়ে রইলেন। এরপর উৎফুল্লকণ্ঠে বললেন—আলহামদুলিল্লাহ। আমি তাহলে আমার গন্তব্যস্থলেই এসেছি?

হ্যাঁ, তাই এসেছেন।

www.boighar.com

আল্লাহ তায়ালার কি মর্জি! না, মর্জি বললেই ঠিক বলা হয় না। কি তার রহমত।

হ্যাঁ, রহম তো জরুর। তা এবার বলুন দেখি, আমাদের এই নটিকাবাড়ি হাইস্কুলে কাজটা কী আপনার? মানে, এখানে কার কাছে এসেছেন?

জি না, কারো কাছে নয়। আমি ঐ হাইস্কুলের থার্ডপণ্ডিতের চাকরি পেয়ে এসেছি। মানে, নিয়োগপত্র পেয়ে।

উল্লাসে নেচে উঠলেন সকলে। চৌধুরী সাহেব পুলকবিস্ময়ে বললেন—আরে সেকি! আপনিই সেই লোক? আমাদের জেলা শিক্ষা অফিসার সাহেব যার সুপারিশ করেছিলেন—আপনিই সেই ব্যক্তি?

জি! আপনাদের জেলা শিক্ষা অফিসার আফজাল আহমদ সাহেব আর আমার বাড়ি এক জায়গাতেই।

হ্যাঁ-হ্যাঁ, শুনেছি। উনি একজন অত্যন্ত সৎ, নীতিবান আর গুণী মানুষ। উনি সুপারিশ করায় তাই কমিটির কেউ কোন আপত্তি করেননি; বরং এতে খুশিই হয়েছে আমরা সবাই।

আপনারা! আপনিও কি কমিটির—

: হ্যাঁ-হ্যাঁ, একজন সদস্য। সেক্রেটারি সাহেবও আমার বন্ধু মানুষ। আমরা সবাই এতে খুশি আছি। কেন জানেন? আমাদের জেলা শিক্ষা অফিসার সাহেব একজন কড়া নীতির মানুষ তিনি লোক দিলে যে সবচেয়ে সেরা লোকটাই দেবেন—এ ব্যাপারে সবাই আমরা নিশ্চিত।

আচ্ছা!

হেডমাস্টারসাহেবও এতে খুব খুশি। তবে এক্ষণে উনাকে খানিকটা চিন্তিত দেখলাম। বললেন, নিয়োগপত্র আমি অনেক আগেই পাঠিয়ে দিয়েছি। তবু কেন যে এখনও সে লোক আসছেন না, কিছু বুঝে উঠতে পারছিনে।

তাই? তা তিনি চিন্তায় আছেন কেন?

সেটা তিনিই ভাল জানেন। তবে উনি বলেন, ইংরেজি গ্রামার পড়ানোর মতো বাংলা ব্যাকরণ পড়ানোরও শক্ত লোক আজকাল আর পাওয়াই যায় না।

বি এ, এম এ অনেকই পাওয়া যায়। কিন্তু বাংলা ব্যাকরণ তো দূরের কথা। তাদের অধিকাংশরাই নাকি বাংলা বানানটাই ঠিক মতো জানে না।

জি-জি, উনার ধারণাটা মোটেই অমূলক নয়।

অনেক দিন থেকেই থার্ডপণ্ডিত নেই। উনি তাই আপনার পথ চেয়ে আছেন আর আপনার থাকার জায়গাও ঠিক করে রেখেছেন।

আমির রেজা সাহেব খোশকণ্ঠে বললেন— এ্যা! ঠিক করে রেখেছেন? আলহামদুলিল্লাহ তা কোথায়?

কিছুদিন হলো স্কুলের সাথেই একটা বড়সড় বোর্ডিং হাউস খোলা হয়েছে। অনেকগুলো ছাত্র আর কয়েকজন শিক্ষক ঐ বোর্ডিং হাউসে থাকেন। আপনার জন্যে সুন্দর একটা রুম রিজার্ভ রেখে দিয়েছেন। হাজার হোক, আপনি শিক্ষা অফিসারের পছন্দের লোক। আপনার অসুবিধে হলে তাঁর কাছে মুখ দেখানো যাবে না। হেডমাস্টার সাহেব তাই চেয়ার-টেবিল-চৌকি দিয়ে ঘরটা সাজিয়ে রেখেছেন। যাবেন আর বিছানা পাতবেন—ব্যস।

চৌধুরী সাহেব হাসতে লাগলেন। কিন্তু অকস্মাৎ চমকে উঠলেন থার্ডপণ্ডিত আমির রেজা। আহসান আলী মৃধা সাহেবকে শশব্যস্তে প্রশ্ন করলেন— আমার বেডিং? আমার বেডিংটা কি আপনারা এনেছেন?

মৃধা সাহেব সবিস্ময়ে বললেন— আপনার বেডিং? কোথায় ছিল বেডিং আপনার?

কেন, ঐ বাসের ছাদে। যে বাসে আমরা এলাম, সেই বাসের ছাদে। আরো তো অনেক লোকের অনেক মালপত্র ছিল ওখানে!

ক্ষণিকের জন্যে নীরব হলেন মৃধা সাহেব। পরে হতাশকণ্ঠে বললেন—তাহলে আর ঐ বেডিং-এর চিন্তা করে কোন লাভ নেই। ওটা ওখানেই গচ্ছা গেছে।

সেকি। গচ্ছা গেছে কী রকম?

: রকমটা হলো, ওটা মেরে দিয়েছেন কেউ। ছাদ থেকে সবার শেষে মাল নামাই আমরা। আমাদের মাল ছাড়া ছাদে আর তখন কারো কোন মালপত্র ছিল না।

ছিল না?

না। মালপত্রের কোন চিহ্নও ছিল না। ছাদ তখন একদম চনচন। আমাদের মাল নামানোর সময় পেছনের মই বেয়ে আমিও ছাদের কাছাকাছি উঠেছিলাম। স্বচক্ষে দেখেছি।

সেকি!

নিশ্চয়ই কোন ধান্দাবাজ লোক নিজের মালের সাথে ওটাও চটপট নামিয়ে নিয়ে গেছে।

মাথায় হাত দিয়ে রেজা সাহেব হতাশকণ্ঠে বললেন— হায় সর্বনাশ! তাহলে

আমার উপায়? বিছানা ছাড়া আমি শোবো কার উপর? তাছাড়া সেরেফ বিছানাপত্রই তো নয়, আরো অনেক কাপড়-চোপড় আর জিনিসপত্তর ঐ বেডিং-এর মধ্যে ছিল।

ছিল? তাহলে আপনি সামান্য একটা চাদর গায়ে দিয়ে শীতে কাঁপছিলেন কেন? বেডিং থেকে কাপড়-চোপড় বা লেপ-কাঁথা বের করে নেননি কেন?

রেজা সাহেব অসহায়কণ্ঠে বললেন- সে সুযোগ আমার ছিল না। বাসে ওঠার আগে গা-টা আমার ম্যাশ ম্যাশ করছিলো বলে ঐ পাতলা চাদরটা বেডিং থেকে বের করে নিয়েছিলাম মাত্র। তারপর হঠাৎ করে এমন বেগে জ্বর এসে গেল যে, সে সুযোগ আর পেলাম না।

বলেন কি!

এটা আমার বিচিত্র এক রোগ। এবার দিয়ে জীবনে এই তিনবার আমার হলো। জ্বর আমার আরো অনেকবারই হয়েছে। একসঙ্গে দশ-পনের দিন একটানা ভুগেছিও কিন্তু এর আগে জীবনে ঐ দুইবার ছাড়া এ অবস্থা আমার আর কখনও হয়নি। অর্থাৎ এই ভুতুড়ে জ্বরটা হঠাৎ করে এসেই অজ্ঞান করে ফেলেনি আমাকে। এবার দিয়ে এই তৃতীয় বার হলো।

তাই নাকি? সত্যিই তো তাহলে এ এক আজব রোগ!

জি একেবারেই আজব। কিন্তু এখন আমি করি কী? এ অবস্থায় তো আবার আমার ঢাকায় ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। মানে, আমার শরীরে কুলোবে না।

চৌধুরী সাহেব বললেন- কেন, ঢাকায় ফিরে যাবেন কেন?

রেজা সাহেব বললেন- তা না গেলে ঐ বোর্ডিং হাউসে গিয়ে আমি শোবো? এছাড়া, আমার অন্য কাপড়-চোপড় আর নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্তর—

হ্যাঁ, সেটা একটা সমস্যাই বটে। তবে আপনার ওসব খোয়া গেছে বলে কি ঢাকাতেই ফিরে যেতে হবে আপনাকে? এখানে কি মানুষ নেই?

জি?

বেডিং নেই তো কী হয়েছে? আপনি আপাতত আমার এখানেই থাকবেন। দ্বিতীয়ত হেডমাস্টারকে বলে এক মাসের অগ্রিম বেতন পাইয়ে দেবো আপনাকে। তা দিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্তর কিনে নেবেন। আমার বাড়িতে অনেক বাড়তি ঘর আছে। আপনার থাকার কোন অসুবিধেই হবে না।

রেজা সাহেব ইতস্তত করে বললেন- আপনার এখানে থাকবো?

অসুবিধে কি? একজন না একজন শিক্ষক তো আমার বাড়িতে থাকেনই প্রায় সবসময়। এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত স্কুলের হেডমাওলানা সাহেব আমার বাড়িতে একটানা কয়েক বছর ছিলেন। এফ্রণে আর কোন শিক্ষক এখানে আসেননি, এই যা।

রেজা সাহেব এরপরও চিন্তিতকণ্ঠে বললেন— কিন্তু, চৌধুরী সাহেব বললেন-
ফের কিন্তু কেন? তবুও ভাবছেন কী?

ভাবছি, আমার মালপত্রগুলো তাহলে হারিয়েই গেল সব!

এবার মৃধা সাহেব সরবে বলে উঠলেন- আরে সামান্য মূল্যের ঐ মালপত্রের
জন্যে এত ভাবছেন কেন? অমূল্য জীবনটাই যে আপনার হারিয়ে যেতে
বসেছিল। সেটা যে হারিয়ে যায়নি, সেজন্য আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায়
করুন। আমাদের নজরে না পড়লে—

তা বটে তা বটে। এজন্যে আপনাদের আমি সবিশেষ ধন্যবাদ জানাই।
আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করার সাথে আমি আপনাকেও অশেষ ধন্যবাদ
জ্ঞাপন করছি।

মৃধা সাহেব হেসে বললেন—তা যদি একান্তই করেন, আমাকে ধন্যবাদ
দেয়ার আগে এই নূরী মামণিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করুন। মামণির জিদের, অর্থাৎ
মামণি নাছোড় পিণ্ডে হওয়ার জন্যেই তো আপনাকে তুলে আনতে বাধ্য হলেম
আমি। আপনার তামাম ধন্যবাদের হকদার আসলেই আমাদের এই মামণি।

ও আচ্ছা-আচ্ছা। উনার প্রতিও আমি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।
উনাকেও অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

চৌধুরী সাহেব ইতোমধ্যেই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। ব্যস্তকণ্ঠে বললেন— হয়েছে-
হয়েছে, অনেক কথা ইতোমধ্যেই বলেছেন। আপনি অসুস্থ মানুষ। তার উপর
গতকাল থেকে অভুক্ত আর কোন কথা নয়। আপনি এবার হাতমুখ ধুয়ে রেডি
হয়ে নিন। এই বৈঠকখানার ওপাশে অন্দরে যাওয়ার পথে যে ঘরে হেডমাওলানা
সাহেব থাকতেন। সেখানেই আপনার থাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আপনি রেডি
হয়ে সেখানে আসুন আগে আহার বিশ্রাম, কথা তারপরে।

সেদিন সন্ধ্যাতক মেহমান আহমদ আমির রেজাকে আর কেউ-ই কোন রকম
ডিস্টার্ব করলেন না। আহার নিদ্রা আর বিশ্রামেই রেখে দিলেন তাঁকে। বাদ
মাগরিব সেখানে এসে হাজির হলেন চৌধুরী সাহেব ও মৃধা সাহেব। নূসরত
জাহান নূরী ও বাড়ির আরো দু'একজন উৎসাহী লোক এক পা দু'পা করে চলে
এলো সেখানে। কথায় কথায় চৌধুরী সাহেব বললেন—আচ্ছা, দেখে তো
তোমাকে খুব সজ্জাস্ত ঘরের ছেলে বলে মনে হচ্ছে। অথচ এতটা কম বয়সে
তুমি—

বলেই হোঁচট খেলেন চৌধুরী সাহেব। ব্যস্তকণ্ঠে বলে উঠলেন— তওবা
তওবা, হঠাৎ করেই আপনাকে তুমি বলে ফেলেছি। আপনি কিছু মনে করবেন
না।

রেজা সাহেব বললেন—না-না, এতে মনে করার কী আছে? আপনি বয়সী
মানুষ—

হ্যাঁ, বয়স হয়েছে তো! তাই কম বয়সের লোক দেখলেই হঠাৎ করে মুখ দিয়ে 'তুমি' বেরিয়ে আসে।

আহম্মদ আমির- রেজা সাহেব উৎসাহ ভরে বললেন—তাই বলবেন-তাই বলবেন। আমাকে আপনারা অর্থাৎ এই বাড়ির মুরব্বিররা, তুমি বললে আমি খুব খুশি হবো। খুবই স্বস্তি পাবো আমি। একই বাড়িতে থেকে আপনারা বাপ বয়সী মানুষেরা আমাকে আপনি আপনি করবেন—এটা বেখাপপাও দেখায়, শুনতেও খারাপ লাগে। বাইরের কেউ হলে অবশ্য সে কথা আলাদা। এই ফ্যামিলির আপনারা আপনাদের ছেলে বয়সী মানুষকে দয়া করে 'আপনি আপনি' করবেন না।

www.boighar.com

মৃধা সাহেব মৃদু হেসে বললেন—ইজায়ত দিচ্ছে?

রেজা সাহেব বললেন—ইজায়ত কী? আমি অনুরোধ করছি। আমাকে আড়ষ্ট করে না রেখে সহজভাবে চলতে দিন।

চৌধুরী সাহেব খোশকণ্ঠে বললেন-বহুৎ খুব-বহুৎখুব! তা যে কথা বলছিলাম। এবার বেলো দেখি, এতটা কম বয়সে তুমি এতদূরে চাকরি করতে এলে, ঘটনা কি? লোকে তো চাকরি করতে ঢাকায় যায়। তুমি ঢাকা ছেড়ে একেবারে এই গৈ-গেরামে?

জি, এটা আমার একটা খেয়ালই বলতে পারেন। ঢাকার ঐ এস্তার কোলাহল আর হৈ হুল্লোড়ের মধ্যে থেকে থেকে আমি হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। কোথায় পালাই—এই কথাই ভাবছিলাম। এই সময় হঠাৎ আপনাদের ঐ জেলা শিক্ষা অফিসার ছুটিতে গিয়ে আমাকে বললেন, “বিএ পাস করার পর আরতো পড়াশোনা করলে না, বাড়িতে বসে রইলে। দেখে শুনে একটা চাকরি-বাকরি করলেই তো পারো” আমি বললাম, “সেই চাকরিটা পাই কোথায়? ঢাকার এই গ্যাঞ্জামের মধ্যে থেকে কোন লাট সাহেবি চাকরিও করতে আমি রাজি নই। আপনি শিক্ষা অফিসার। যদি পারেন, গ্রামের কোথাও কোন প্রাইমারী স্কুলে একটা চাকরি দেন আমাকে, আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।”

চৌধুরী সাহেব হাসিমুখে বললেন—আচ্ছা-আচ্ছা! আফজাল আহম্মদ সাহেব বললেন, “সত্যিই যদি তাই চাও, তাহলে এখনই তোমাকে তা দিতে পারি আমি। অর্থাৎ সে রকম একটা সম্ভাবনা হাতে আছে আমার। তবে সেটা নিকটে নয়-বহুৎ দূরে আর প্রাইমারী স্কুলে নয় হাইস্কুলে। হাইস্কুলের থার্ডপণ্ডিতের চাকরি।” শুনে আমি অত্যন্ত খুশি হলাম আর এক কথায় রাজি হয়ে গেলাম।

তারপর?

: তারপর? দরখাস্ত করলাম। কিছুদিন পরে তিনি জানালেন, “এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার-মানে, নিয়োগপত্র যাচ্ছে, তৈরি হয়ে চলে এসো।” পরে ঠিকই নিয়োগপত্র পেলাম আর তৈরি হয়ে চলে এলাম।

সাব্বাস! তা গ্র্যাজুয়েট লোক তুমি, হেডমাস্টার বা এ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টারের পদ না খুঁজে থার্ডপণ্ডিত হতে রাজি হলে কেন?

দেখুন, ওসবে অভিজ্ঞতা লাগে, বিটি.-বি-এড হতে হয়, আগে না হয়ে থাকলে পরে বিটি. বি-এড করতে হয়-বহুৎ ঝামেলা। অতশত ঝামেলা ভাল লাগে না আমার। তাছাড়া এই থার্ডপণ্ডিতের মাইনেটাই যত টাকা করেছেন আপনারা, অন্য অনেক হাইস্কুলের হেডমাস্টার সাহেবরাও এতো মাইনে পান না।

হ্যাঁ, এই দুর্গমপল্লীতে কেউ সহজে আসতে চান না বলেই মাইনেটা বেশি করা হয়েছে। অর্থের কোন অনটন নেই। এখানে যেমন প্রচুর গরিব লোক আছে, তেমনই অর্থ যোগান দেয়ার মতো বেশ কিছু ধনী লোকও আছে। এ ছাড়া স্কুলে গেলেই দেখতে পাবে, প্রচুর ছাত্রছাত্রী। তাদের বেতন থেকেই স্কুলের খরচ প্রায় সম্পূর্ণটাই উঠে আসে।

ও আচ্ছা। সত্যি কথা বলতে কি, এই মাইনেটার পরিমাণ দেখেও আরো আগ্রহী হয়ে এলাম।

মৃধা সাহেব কথা ধরে বললেন- বেশ করেছেন- বেশ করেছেন। তা বলছিলাম কি, শিক্ষা অফিসার সাহেবের মুখটা রক্ষে করতে পারবেন তো?

অর্থাৎ?

থার্ডপণ্ডিতের কাজটা বেশ কঠিন কাজ। শুনতে যত সহজই মনে হোক, বাংলা আর বাংলা ব্যাকরণ পড়ানোটা খুব একটা সহজ কাজ নয়, শক্ত কাজ। অনেক বয়সী আর অভিজ্ঞ পণ্ডিতেরাও হিমশিম খেয়ে যান।

তা বটে। তবে সে সাহস আমার আছে বলেই এসেছি। বেশ-বেশ। থার্ডপণ্ডিত সাহেবেরা সাধারণত বেশ বয়সী মানুষ হন তো, আই এ, বি এ না হলেও তাঁদের জিটি. ভি এম ট্রেনিং থাকে। তাই বলছিলাম।

আমার জি. টি. ভি. এম নেই। তবে আই. এ. তে আমার স্পেশাল বেঙ্গলি ছিল। এছাড়া, বাংলা সাবজেক্টটা আমার ভালও লাগে খুব। একবার চেষ্টা করে দেখি তো! না পারলে নিজেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে যাবো।

এবার মুখ খুললো নূসরত জাহাঁন নূরী। সে নাখোশকণ্ঠে বললো-মামুজান, এসব কী হচ্ছে? ভালভাবে না জেনে না শুনেই একজন ভদ্রলোককে এমন আণ্ডার এস্টিমেট করতে শুরু করলেন কেন? এতে তাঁকে অপ্ৰতিভই করা হচ্ছে না শুধু, অপমানিতও করা হচ্ছে।

মৃধা সাহেব চমকে উঠে বললেন- না-না, সে রকম কোন অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আমি বলিনি। আমি এমনি কথার কথা বলছি।

তাই বা বলবেন কেন? সেটা কোন ভদ্রতার পরিচয় নয়।

মৃধা সাহেব সমর্থন দিয়ে বললেন হ্যাঁ-হ্যাঁ, সেটাও তো ঠিক কথা। কিছু মনে

করো না ইয়াংম্যান। জানোতো, বয়স অধিক হলেই মানুষের হুঁশ-ফোম অল্প হয়ে যায়? অতএব-সাত খুন মাফ!

সশব্দে হাসতে লাগলেন মৃধা সাহেব। চা-নাশতা নিয়ে চাকর-বাকর ঢুকে পড়লে ছেদ পড়লো তাঁর হাসিতে।



আরো একদিন বিশ্রাম নিয়ে তারপরের দিন চাকরিতে যোগদান করতে রওনা হলেন থার্ডপণ্ডিত আহমদ আমির রেজা সাহেব। তাকে সাথে করে নিয়ে চললেন নূরীর আব্বা চৌধুরী সাহেব, নূরীর মামা মৃধা সাহেব ও স্থানীয় আর একজন লোক। নতুন থার্ডপণ্ডিত সাহেব এসেছেন এবং কাজে যোগ দিতে আজ তিনি স্কুলে আসছেন-একথা স্কুলে ও চারপাশে আগেই প্রচার হয়ে গিয়েছিল। আরো প্রচার হয়ে গিয়েছিল যে, এ লোক জেলা শিক্ষা অফিসার সাহেবের নিজের নির্বাচিত লোক এবং আগের থার্ডপণ্ডিতদের চেয়ে বাংলা ভাষায় অধিক জ্ঞানসম্পন্ন এক ঝানু ব্যক্তি। ফলে, তাঁকে দেখার জন্যে স্কুলের বর্তমান ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকবৃন্দ ছাড়াও, প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী ও আশপাশের বেশকিছু লোকজন বিশেষ আগ্রহী ছিলেন।

তাই যথা সময়ে সবাই এসে ভিড় জমালেন স্কুলে। শুধু হেডমাস্টার সাহেব তাঁর নিজ কক্ষে এবং কয়েকজন সিনিয়র শিক্ষক স্টাফরুমে রইলেন আর বাদবাকি সকল শিক্ষক বেরিয়ে এলেন বাইরে। স্টাফরুমের বারান্দায় এসে তারা পায়চারি করতে লাগলেন। ক্লাসরুমের বারান্দায় ও আঙ্গিনায় ভিড় জমিয়ে রইলো ছাত্রছাত্রীর দল ও বহিরাগত লোকজন। ছাত্রছাত্রীদের অনেকের বুকই টিপ টিপ করতে লাগলো, আগন্তুক থার্ডপণ্ডিতের ভয়ে। তারা ভাবতে লাগলো, আগেকার থার্ডপণ্ডিতের চেয়ে এ পণ্ডিত যে আবার কতটা খিটমিটে আর বদমেজাজি হন, কে জানে।

সবার নজর পথের দিকে। চৌধুরী সাহেব ও মৃধা সাহেবসহ জনাচারকের লোককে স্কুলের দিকে আসতে দেখেই সবাই চঞ্চল হয়ে উঠলেন। কারণ, সবাই জানতেন নতুন থার্ডপণ্ডিত সাহেব এসে চৌধুরী সাহেবের বাড়িতেই আছেন।

থার্ডপণ্ডিত আমির রেজা সাহেবসহ চৌধুরী সাহেবেরা এলেন এবং এসে প্রধান শিক্ষকের কক্ষের দিকে যেতে লাগলেন। চৌধুরী সাহেব হাজি মানুষ ও একজন গণ্যমান্য লোক। মৃধা সাহেবও তাই। তাঁদের সম্মান করেন সকলে। তাঁরা স্কুল প্রাঙ্গণে এলে সবাই তাঁদের সালাম দিতে লাগলেন আর সালামের জবাব দিতে দিতে তারা হেডমাস্টারের কক্ষের দিকে এগুতে লাগলেন। একমাত্র আমির রেজা সাহেব ছাড়া এরা সবাই চেনা লোক। একেবারে ছেলে মানুষ না হলেও, রেজা সাহেবও কোন বয়সী লোক নন। কাজেই, থার্ডপণ্ডিত সাহেব কই আর কোথায়- এই মর্মে সবাই এদিক-ওদিক নজর ফেরাতে লাগলেন।

হেডমাস্টারের কক্ষে এরা চলে যাওয়ার পরও অনুসন্ধিৎসু নয়নে সকলে দাঁড়িয়ে রইলেন বাইরে।

এ দৃশ্য স্বাভাবিকতায় পড়ে না। ছোটখাটো কোন ভিআইপিকে ঘিরেও এমনটি হয় না। কাজেই, একজন থার্ডপণ্ডিতের আগমনকে কেন্দ্র করে এমন ব্যগ্রতা-ব্যস্ততা শুধু নজির বহির্ভূতই নয়। বাড়াবাড়ি আর বেমানানও। এমনটিই মনে হওয়া স্বাভাবিক। অন্যখানে হলে তাই মনে হতো কিন্তু এখানে এ ঘটনাটি একটি আলাদা বিষয়, এর প্রেক্ষাপটও পৃথক। এ এলাকা অত্যন্ত পশ্চাদপদ এলাকা। সাঁওতাল বুনোর বসতি এখনও নগণ্য নয় এখানে। রাজধানী ঢাকা এখানকার শতকরা প্রায় নব্বই ভাগ মানুষের কাছে একটা কল্পনার জগৎ। এরা চোখে কখনো দেখেনি। ঢাকার লোকও এ এলাকায় কালেভদ্রে আর কদাচিৎ আসেন। এবারের থার্ডপণ্ডিত আসছেন সেই রাজধানী ঢাকা থেকে। সেই সাথে আছে ঐ প্রচণ্ড প্রচার-নতুন থার্ডপণ্ডিত একজন মস্তবড় পণ্ডিত মানুষ আর জেলা শিক্ষা অফিসার সাহেবের বেছে দেয়া লোক আর লাগে কী? সব মিলে এই থার্ডপণ্ডিতের আগমনকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে আর নতুনমাত্রা যোগ করেছে এতে।

কিছুক্ষণ পরে থার্ডপণ্ডিত আমির রেজা সাহেবকে নিয়ে হেডমাস্টার সাহেব বেরিয়ে এলেন বাইরে। রেজা সাহেবকে সামনে এগিয়ে দিয়ে তিনি সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন— এই যে ইনিই আমাদের সেই নতুন থার্ডপণ্ডিত সাহেব। ঢাকা থেকে এসেছেন। একে আপনারা এখন এই গাঁয়ে আর আশপাশে প্রতি দিনই দেখতে পাবেন। তাই বাইরের লোক যাঁরা আছেন, তাঁরা দয়া করে এখন স্কুল আঙ্গিনার বাইরে চলে যান। কারণ, এখনই ক্লাস শুরু হবে আর ছাত্রছাত্রী তোমরা সবাই নিজ নিজ ক্লাসে চলে যাও। ক্লাসেই এখন একে দেখতে পাবে তোমরা।

রেজা সাহেবকে নিয়ে আবার নিজ কক্ষে ফিরে গেলেন হেডমাস্টার সাহেব। কিন্তু উপস্থিত জনতার চোখ তখন ছানাবড়া! আই এ ফেল শিক্ষক আলেফ মিয়া একজন কম বয়সী লোক। নিচু ক্লাসে পড়ান আর মনটাও তাঁর নীচু। বিশ্ব নিন্দুক মানুষ তিনি। অন্যের খুঁত ধরে বেড়ানোই তাঁর স্বভাব। নতুন থার্ডপণ্ডিতকে দেখে অন্যেরা সবিস্ময়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন আর আলেফ মিয়া এই পণ্ডিতের খুঁত ধরতে তৎপর হয়ে উঠলেন। মুখে ভেংচি কেটে পাশে দণ্ডায়মান বাইরের এক ইয়ারকে তিনি বললেন—সে কী রে! একি থার্ডপণ্ডিতের ছিঁরি।

ইয়ারটি খতমত করে ভললেন— হ্যাঁ-হ্যাঁ, কেমন যেন বেমানান বেমানান লাগছে! মানে খুবই বেখাপ্পা!

চোখমুখ বিকৃত করে আলেফ মিয়া বললেন— শুধুই বেখাপ্পা? একদম অযোগ্য। আনফিট অপদার্থ, একে দিয়ে চলবে কী করে? সব কাজেই তো একটা ফিটনেস প্রয়োজন?

তাই তোরে! স্কুল কর্মিটির লোকেরা একে আমদানি করলো কী দেখে?
তাহলেই বোঝো। হালের বলদ কিনতে গিয়ে আস্ত একটা দুধের বাছুর কিনে
এনেছে এরা।

দুধের বাছুর? ঠিক বলেছিস - হ্যাঁ ঠিক বলেছিস।

ঠিক নয়?

হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই বলেই মনে হচ্ছে।

মনে হচ্ছে কিরে? থার্ডপণ্ডিতদের কি এর আগে আমরা কখনো দেখিনি?
থার্ডপণ্ডিত মানেই ঝুনো নারকেল। 'তাঁরা হবেন দাঁতপড়া গাল ভাঙা ঝুনো
মানুষ। মাথায় থাকবে টাক। হিন্দু হলে, সেই টাকের উপর টিকি থাকবে
একটা। চোখে থাকবে হ্যাঙেলভাঙা সুতোয় বাঁধা চশমা, নাকের নিচে সজারু
কাঁটার মতো এক থোকা কাঁচাপাকা গৌফ, মুখ হবে মাকুন্দ, গায়ে থাকবে আর
বেনিয়ান আর কাঁধে থাকবে ভাঁজ করা, আধময়লা চাদর। এই হলো মোটামুটি
থার্ডপণ্ডিতদের বরাবরের চেহারা। সেখানে একি!

হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই তোরে!

এ ব্যাটার টাক নেই, টিকি নেই, সুতোয় বাঁধা চশমা নেই, গৌফ নেই,
নাকের নিচে আর মাকুন্দ মুখে না হয়ে ওদিকে আবার নিবিড় দাড়ি জমিয়েছে
মুখে। আরো দেখ, টাকের বদলে এক মাথা ব্যাকব্রাশ কালো চুল, ঝকঝকে
দাঁত আর পরনে বেনিয়ানের বদলে ফিনফিনে পায়জামা আর পাঞ্জাবি। বয়সী
তো নয়ই, একেবারেই নাটক-সিনেমার এক উদীয়মান নায়ক। মুখে দাড়ি না
থাকলে বিলকুল এক উত্তম কুমার।

তা যা বলেছিস। চেহারাখানা কিন্তু সত্যিই খাশা! উত্তম কুমারকেও ছাড়িয়ে
যায় অনেকখানি। কি দবদবে গায়ের রঙ।

আরে রাখ তোর গায়ের রঙ। চেহারা দিয়ে কী হবে? এখানে কী সিনেমা
নাটক করার জন্যে আনা হয়েছে তাকে? আনা হয়েছে বাংলা ব্যাকরণ পড়াতে।
সন্ধি, সমাস, কারক, ধাতু, প্রত্যয় উঃ। কি সব কটমটে ব্যাপার। কৃৎ প্রত্যয়
শিখতে গেলে, পণ্ডিতের পিটুনিতে চিৎ-প্রত্যয় না করে তা শেখা যায় না। এসব
শেখাবে ঐ দাড়িওয়ালা উত্তম কুমার? কাপড়-চোপড় খারাপ করে ফেলবে না?

ওয়ানিং বেল ইতোমধ্যেই পড়েছিল। এই সময় ঢং করে বাড়ি পড়লো বেলে।
বেজে গেল ক্লাস শুরু হওয়ার ঘণ্টা। ঘণ্টা বাজতেই ছাত্রছাত্রীরা সবাই দ্রুতপদে
ক্লাসরুমে আসন গ্রহণ করলো। বহিরাগত লোকেরাও আস্তে আস্তে স্কুল প্রাঙ্গণ
ত্যাগ করতে লাগলো। বন্ধ হলো আলেফ মিয়ার নিন্দাবাদ। স্টাফরুমে ছুটে
গিয়ে চক-ডাস্টার আর রোলকলের খাতা খুঁজতে লাগলেন তিনি। কারণ তিনি
জানেন, ক্লাসে যেতে দেরি হলে হেডমাস্টারের তিরস্কার ছুটে আসবে পেছনে।

এদিকে দৃষ্টিস্তা কেটে গেল ছাত্রছাত্রী সবার। তারা হুঁচকিত্তে সিনেমা

বসলো। সেই সাথে একে অন্যের কাছে ব্যক্ত করতে লাগলো নিজ নিজ অভিব্যক্তি। বলতে লাগলো-বাব্বা, বাঁচা গেল! আর নাহোক, এ পণ্ডিতের চেহারাটা কাঠখোঁটা আর মামদোমার্কী নয়। কি সুন্দর মোলায়েম আর মিষ্টি মিষ্টি চেহারা। এ লোক বদমেজাজি হতেই পারে না।

তা যে তিনি পারেন না, ঐ দিনই কয়েকটা ক্লাসে গিয়ে নতুন থার্ডপণ্ডিত আমির রেজা তা প্রমাণ করে এলেন। জয় করে এলেন ছাত্রছাত্রীদের অন্তর আর হেডমাস্টারের আস্থা।

www.boighar.com

নতুন এই থার্ডপণ্ডিতকে নিয়ে নূসরত জাহান নূরীর দৃষ্টিস্তাও কম ছিল না খুব একটা। মূলত নূরীই জিদ ধরে লোকটাকে বাস থেকে বাড়ি পর্যন্ত এনেছে। এ পর্যন্ত লোকটার প্রতি অনুকম্পা সে-ই দেখিয়েছে অধিক। অসুস্থ এই লোকটার সেবায় সর্বাধিক ছিল তারই আত্মনিয়োগ। লোকটার পক্ষ নিয়ে অন্যের বিরূপ মন্তব্যের বিরুদ্ধে ইতোমধ্যে মৃদুমন্দ প্রতিবাদ করেছে একমাত্র নূসরত জাহান নূরীই। এতে করে অজ্ঞাতে ও অলক্ষ্যে এই লোকটা কম বেশি তারই লোক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে এবং লোকটার অভিভাবক হিসেবে ঝি-চাকরসহ বাড়ির লোকজন মোটামুটি নূরীকেই গণ্য করতে শুরু করেছে।

এমতাবস্থায় নূরীর পক্ষে একেবারেই দায় এড়ানো সম্ভবপর ছিল না। কাজের বেলায় লোকটা একেবারেই গোবর-গণেশ হলে, নূরীর মুখ উজ্জ্বল হওয়ার মওকা ছিল না একবিন্দুও। লোকটার অখ্যাতিতে আর পাঁচজনের মতো হো-হো করে হাসার তিল পরিমাণ সুযোগ ছিল না নূরীর। তাই, আমির রেজা সাহেব স্কুল থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত বেজায় উদ্ভিগ্ন ছিল সে।

রেজা সাহেব ফিরে এলেন বিকেল পাঁচটার পরে। ফিরে এসে রেজা সাহেব তাঁর ঘরে ঢুকলে, নূরীর ইচ্ছে হলো, তখনই সে খবর করতে ছুটে যায় সেখানে। কিন্তু সংকোচ এসে তার পথ আগলে দাঁড়ানোর ফলে এগিয়ে এসেও দাঁড়িয়ে রইলো নূরী। কি অজুহাতে ঐ ঘরে ঢোকা যায়, ভাবতে লাগলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

এমন সময় নূরী দেখতে পেলো, বাড়ির কাজের ঝি সোহাগী রেজা সাহেবের চা-নাশতা নিয়ে তাঁর ঘরের দিকে যাচ্ছে। দেখেই মাথার ওড়নটা টেনে দিলো নূরী এবং সোহাগীর সঙ্গ নিয়ে সেও ঢুকে পড়লো রেজা সাহেবের ঘরে। ঘরে ঢুকেই খাজিনদারি শুরু করে দিলো। রেজা সাহেবের দিকে চা-নাশতা এগিয়ে দিতে দিতে নূরী তাঁকে প্রশ্ন করলো-প্রথম দিনেই এতটা সময় স্কুলে কাটালেন?

রেজা সাহেব ঈষৎ হেসে নত মস্তকে বললেন — স্কুল তো পাঁচটায় বন্ধ হয়। তার আগে আসি কী করে? নূরী বললো-আসি কী করে মানে? এটাতো আপনার প্রথম দিন। আপনি অসুস্থ মানুষ। শরীর আপনার এখনও পুরোপুরি ঠিক হয়নি। স্কুলে যোগদান করেই তো চলে আসতে পারতেন।

তা হয়তো পারতাম। কিন্তু আসি কী করে? থার্ডপণ্ডিত না থাকায় বাংলা,

বিশেষ করে, বাংলা ব্যাকরণের ক্লাসগুলো দীর্ঘদিন যাবৎ হয়নি। আমি আসার পরেও কি ক্লাসগুলো ফেলে রেখে চলে আসা যায়?

আচ্ছা। তা কী করলেন? আজই ঐসব ক্লাস নিতে গেলেন?

হ্যাঁ, গেলাম। ক্লাস সেভেন থেকে ক্লাস টেন পর্যন্ত সব ক্লাসেই গেলাম।

কী পড়ালেন? শুধু বাংলা গদ্য-পদ্য, না ব্যাকরণও পড়ালেন?

সব। তবে ব্যাকরণে দেখলাম, সব ক্লাসের ছাত্রছাত্রীরাই খুব পিছিয়ে।

তাই ব্যাকরণের ক্লাসগুলোই বেশি করে নিলাম।

নূরী এবার ইতস্তত করে বললো— কিছু মনে করবেন না, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

করুন।

ক্লাসগুলো কি ঠিক মতো নিতে পারলেন? মানে ব্যাকরণ পড়াতে গিয়ে কোনরকম অসুবিধা হলো না তো আপনার?

আমির রেজা সাহেব সবিস্ময়ে বললেন— অসুবিধে! এ কথা বলছেন কেন?

না, ব্যাকরণটা খুবই কটমটে ব্যাপার তো! অনেকেরই ওটার উপর দখল তেমন থাকে না। পুরনো পণ্ডিতের কাজ ওটা, তাই বলছিলাম।

চোখ তুলে লহমা খানেক চেয়ে থাকার পর রেজা সাহেব বললেন— ব্যাপারটা কী বলুন তো? আমি এসে অবধি লক্ষ্য করছি, আকারে ইস্তিতে সবাই যেন এই রকমই কী একটা বলতে চাচ্ছেন। ভাবছেন, আমি বোধ হয় ব্যাকরণটা ঠিক মতো পড়াতে পারবো না। থার্ডপণ্ডিতের কাজটা বোধহয় আমার দ্বারা হবে না। স্কুলেও কয়েকজন শিক্ষকের কথাবার্তায় এমনই একটা আভাস ছিল। এর কারণটা কী?

কারণটা অন্য কিছুই নয়। কারণটা আপনার এই কচি বয়স।

কচি বয়স! কেন, আমাকে কী দেখতে খুবই ছেলে মানুষ মনে হয়? বি এ পাস করেছি সেই কবে!

তা করুন। দেখতে কিন্তু আপনাকে এখনও ছেলে মানুষই মনে হয়। আর এই কারণেই সকলের এই ধারণা।

অর্থাৎ?

এই সাবজেকটর উপর বয়সী লোকদেরই দখল থাকে বেশি তো, তাই আপনার বয়স দেখে, মানে চেহারা দেখে, অনেকের এই সন্দেহই হচ্ছে যে, এটা বুঝি আপনি ভালমতো পড়াতে পারবেন না।

রেজা সাহেব গম্ভীরকণ্ঠে বললেন—হুঁউ, বুঝেছি। ব্যাপারটা তাই-ই হবে হয়তো। আপনার আক্বা, বিশেষ করে আপনার মামুজান, সেদিন এমনই কিছু কথাবার্তা বললেন। কিন্তু আমি ভেবে পাইনে, একদিকে তাঁরা জেলা শিক্ষা-

অফিসারের নীতি আর ব্যক্তিত্ব নিয়ে জোর প্রশংসা করছেন, অন্যদিকে তাঁরই বেছে দেয়া লোকের যোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করছেন। এটা একটা ডকট্রিন অব প্যারাডকস। রীতিমতো সেলফ কন্ট্রাডিক্টরি-ব্যাপার।

নূসরাত জাহান নূরী খতমত করে বললো— জি?

রেজা সাহেব কণ্ঠে জোর দিয়ে বললেন—সে যোগ্যতাই যদি না থাকবে আমার, তাহলে আমিই বা এ কাজে আসবো কেন আর শিক্ষা অফিসার সাহেবই বা আমার জন্যে সুপারিশ করবেন কেন?

নূরীর আর বলার কিছু রইলো না। সে নীরব হয়ে গেল। রেজা সাহেব চাপ দিয়ে বললেন—কিছু বলছেন না যে?

নূরী বললো—কী বলবো? আপনার এই অকাট্য যুক্তির পরে আর কোন কথা চলে না। আপনার অবস্থানকে আপনি এক কথায় পরিষ্কার করে ফেলেছেন।

ফেলেছি নাকি?

: নিঃসন্দেহে। সত্যি কথা বলতে কি, আপনার ওপর এ ব্যাপারে আমার কিন্তু পুরো আস্থা ছিল।

তাহলে আর এ প্রশঙ্গ টানছেন কেন?

নূরী ধীরকণ্ঠে বললো—আপনাকে আমি জিদ করেই তুলে এনেছি বাস থেকে। আপনি অপ্রস্তুত হলে আমিও যে শরম পাবো, তাই।

নূরী মাথা নিচু করলো। রেজা সাহেব সাহস দিয়ে বললেন—তাহলে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন যে, এ ব্যাপারে আপনার শরম পাওয়ার কোন কারণই ইনশাআল্লাহ কখনো ঘটবে না। আরো কয়েকদিন যাক, স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জিজ্ঞেস করলেই বুঝতে পারবেন সেটা।

রেজা সাহেব মৃদু হাসতে লাগলেন। নূরীও ঈষৎ হেসে বললো—জিজ্ঞেস করার আর কোন প্রয়োজন নেই। আপনার এই দৃঢ়তাই আমার জন্যে যথেষ্ট।

চা-নাশ্তা শেষে কাজের বেটি সোহাগী বাসনপত্র গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে যেতে লাগলো। নূরীও অগত্যা তাকে অনুসরণ করার উদ্যোগ নিতেই রেজা সাহেব ব্যস্তকণ্ঠে বললেন— একটা কথা জানার আমার খুবই আগ্রহ ছিল।

থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে নূরী বললো— কী কথা?

রেজা সাহেব বললেন— স্কুলে দেখলাম বেশকিছু ধুতিপরা আর শাড়ি পরা কালো কালো ছাত্রছাত্রী। পোশাক-আশাকও তাদের অপেক্ষাকৃত কম পরিষ্কার। এরা কী সব সাঁওতালদের ছেলেমেয়ে?

হ্যাঁ, অধিকাংশই সাঁতালদের। উঁচু জাতের হিন্দু দু'চার ঘর থাকলেও, সংখ্যায় সাঁওতালেরাই অধিক।

তাই না কি?

হ্যাঁ। এক কালে তো এ অঞ্চলে সাঁওতালবুনোই বাস করতো

একচেটিয়াভাবে। অন্য জাতির অস্তিত্ব ছিল একান্তই বিরল। ইলামিত্রের নাম শুনেছেন? ঐ যে সাঁওতাল বিদ্রোহের কথা? ঐ ঘটনা এই অঞ্চলেরই ঘটনা।

হ্যাঁ-হ্যাঁ শুনেছি।

: তখন আর তার আগে এই এলাকা ভর্তি ছিল সাঁওতাল বুনোয়। এখন তারা হারিয়ে গেছে বিপুলাংশে।

আচ্ছা। তা যারা এখনও অবশিষ্ট আছে, তারা কোন দিকে, অর্থাৎ কোন গ্রামে বেশি আছে-তা কি বলতে পারেন?

পারিই তো। অনেক গাঁয়েই কিছু কিছু আছে। তবে স্কুলের পাশেই দক্ষিণ দিকে যে গাঁ-টা আছে ওটাতে এখনও তুলনামূলকভাবে বেশি সাঁওতাল বাস করে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। কিন্তু কেন বলুন তো? এ কথা জানতে চাইছেন কেন?

রেজাসাহেব আমতা আমতা করে বললেন- না, মানে আমরা ঢাকার লোক তো? সাঁওতাল বুনো খুবই কম দেখেছি আমরা। তাই এখানে আসার কথা হওয়ার পর থেকেই ওদের সম্বন্ধে জানার আমার বিশেষ একটা আগ্রহ, একটা কিউরিওসিটি সৃষ্টি হয়েছে- এই আর কি!

রেজা সাহেব হাসতে লাগলেন। নূরীর সাথে বাসনকোষণ হাতে বিটাও দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এবার সে বললো- আমি যাই আপা?

নূরী বললো- চলো, আমিও যাচ্ছি—

দুইজনই বেরিয়ে গেল অতঃপর।

দিন দুইয়েক পরে কাজের মেয়ে সোহাগীর সাথে নূসরত জাহান নূরী হঠাৎ আবার রেজা সাহেবের ঘরে চলে এলো। রেজা সাহেব এক ফাঁকে নূরীকে বললেন- আমার বিদ্যার খবর তো আপনারা সবাই মিলে অনেকই করলেন। কিন্তু আপনাদের খবর আমার কিছুই জানা হলো না। বিশেষ করে, আপনার আর আপনার মামুজানের।

জবাবে নূরী বললো- কী খবর জানতে চান?

রেজা সাহেব বললেন-অন্তত লেখাপড়ার। আপনাদের দুইজনেরই কথাবার্তাতে বোঝা যাচ্ছে, আপনারা বেশ শিক্ষিত লোক। রীতিমতো শিক্ষিত লোক আপনারা।

তাই নাকি!

আপত্তি না থাকলে আগে আপনার কথাটাই বলুন। এখনও কি লেখাপড়া করেন আপনি?

নূরী হালকাকণ্ঠে বললো-করতাম। কিন্তু এখন বোধ হয় চুকেই গেল সে পাঠ।

অর্থাৎ?

আই. এ পরীক্ষা দিয়ে এলাম। বি এ পর্যন্ত এটা আর নাও গড়াতে পারে।

কেন- কেন?

সেটা আমাদের পারিবারিক ব্যাপার। পরে জানতে পারবেন।

ও আচ্ছা। তা কবে দিয়েছেন আই এ পরীক্ষা? কোন বছর?

এই তো সেদিন। আই এ পরীক্ষা দিয়েই তো ঐ বাসে সেদিন আসছিলাম।

কোন বাসে?

: আরে, ভুলে গেলেন নাকি সব। যে বাসে আপনি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন, সেই বাসে।

নড়েচড়ে উঠে রেজা সাহেব বললেন-এঁ্যা! তাই নাকি? তা কোথা থেকে আসছিলেন?

নবাবগঞ্জ থেকে। নবাবগঞ্জ কলেজেই পড়তাম আমি।

ওখান থেকেই পরীক্ষা দিয়ে এলেন বুঝি?

জি-জি।

ওখানে কোথায় থাকতেন?

: মেয়েদের হোস্টেলে। পরীক্ষা হয়ে গেল, তাই আমিও বাড়ির পথ ধরলাম। বেডিংপত্র বেঁধে নিয়ে হোস্টেল ত্যাগ করে চলে এলাম। ঐ আসার পথেই তো বাসের মধ্যে আবিষ্কার করলাম আপনাকে।

ও আচ্ছা-আচ্ছা। এই ঘটনা তাহলে? তা আপনার মামুজান? উনিই বুঝি আপনাকে-

হ্যাঁ, উনিই আমাকে নবাবগঞ্জ থেকে নিয়ে এলেন। আব্বাজানের চেয়ে মামুজান এখনও বেশ শক্ত আছেন তো, তাই আব্বাজান মামুজানকেই পাঠিয়ে ছিলেন আমাকে আনার জন্যে।

আপনার কোন ভাইটাই নেই?

আছে তো। ছোট এক ভাই আছে। ঐ যে পাঠশালায় পড়ে। আর এই বাইরের আঙ্গিনাতে দৌড়াদৌড়ি করে বেড়ায় যখন তখন, ঐটাই আমার ভাই?

ও! তা আপনার ঐ মামুজান? উনি কী আপনাদের বাড়িতেই থাকেন?

আপাতত তাই আছেন।

উনার লেখাপড়া, বাড়িঘর, মানে—

এক কথায় বলতে গেলে, মামুজান ক্লাস টেন পর্যন্ত পড়েছেন। উনি বিপত্নীক, নিঃসন্তান আর কিছুটা ভবঘুরে। মামী মারা যাবার পর থেকেই ঘর ছেড়েছেন উনি। অধিক সময় আমাদের এখানেই থাকেন। আমার আব্বু আবার আমার এই মামুজানকে খুব ভালবাসেন কিনা, তাই এখানকার টান তাঁর খুব

বেশি। একবার এলে দীর্ঘদিন থাকেন।

উনার নিজের বাড়ি কোথায়? বাড়িতে তাঁর আর কেউ নেই?

আছেন তো, আমার আরো দুই মামা আছেন। ঐ থানার পাশে মস্তবড় বাড়ি। উনারাও বিরাট বড়লোক। অনেক জমির মালিক। আমার এই মামুজানের অংশেও অনেক জমি পড়েছে কিন্তু আমার এই মামুজান কদাচিৎ সেখানে যান। আমার অন্য দুই মামাই ভোগ করেন এর ভূসম্পত্তি।

আচ্ছা!

আর কিছু জানার আছে?

এঁয়া? না-না, আর কি! এই-ই যথেষ্ট।

এবার আপনার কথা বলুন।

আমার কথা!

হ্যাঁ! আমাদের এত খবর নিচ্ছেন, আর আপনার খবর দেবেন না। রেজা সাহেব হেসে বললেন- জি-জি অবশ্যই দেবো।

বলুন—

আপনার বাড়ি কি ঢাকা শহরেই।

হ্যাঁ শহরেই। ওখানেই মাথাগোঁজার মতো ছোট্ট একটা ঠাই, মানে বাড়ি-
আছে আমার।

আপনার আব্বা-আম্মারা কি জীবিত?

জি-না। তাঁরা দুইজনই জান্নাতবাসী হয়েছেন।

তাহলে বাড়িতে আপনার আর কে আছেন?

নিজের আর তেমন কেউ নেই। অন্যেরা বাড়িঘর দেখাশোনা করে।

সেকি! অন্যের উপর বাড়িঘর ফেলে এতদূরে চাকরি করতে এলেন আপনি?

আসতেই হবে। চাকরি করে খেতে হলে বাড়িঘর ফেলে যেতেই হবে দূরে। সরকারি চাকরি হলেও ঐ এক কথা। সারা বছর বাইরে।

হ্যাঁ, সে কথা অবশ্য ঠিক।

একটু থেমে নূরী ফের বললো- শাদি করেননি আপনি?

এঁয়া? শাদি? না-না, ওটা আর হয়ে উঠলো কই?

কই কেন? শাদির বয়স কী আপনার হয়নি?

রেজা সাহেব হেসে বললেন-হয়েছে কি? আপনারাই তো সে সার্টিফিকেট আমাকে দিচ্ছেন না। আপনারাই বলছেন, আমি নিতান্তই ছেলে মানুষ, ছাত্র পড়ানোর বয়স আমার হয়নি। তাই যদি না হয়ে থাকে, শাদির বয়সটা আর হয়

কী করে?

রেজা সাহেব হাসতে লাগলেন। এই সময় সেখানে এসে হাজির হলেন নূরীর মামা আহসান আলী মৃধা সাহেব। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে তিনি উচ্চকণ্ঠে বলতে লাগলেন— ঝানু-মাল, ঝানু-মাল। বুঝলে মা-নূরী, আমাদের এই পণ্ডিত সাহেব একেবারেই একজন ঝানু পণ্ডিত। কতদিন ধরে যে এই পেশায় তিনি আছেন— আল্লাহ মালুম।

নূরী প্রশ্ন করলো— কেন মামুজান, কী হয়েছে?

মৃধা সাহেব সোল্লাসে বললেন— মাং করে দিয়েছে— একদম মাং করে দিয়েছে। এই দুই-তিন দিনেই ছাত্র-শিক্ষক-হেডমাস্টার, সবাইকে এই ইয়াংম্যান বোবা বানিয়ে দিয়েছে। এই পণ্ডিতের প্রশংসায় সবার মুখে খই ফুটছে দেখে এলাম।

তাই নাকি?

তো আর বলছি কি? দেখতে ছেলে মানুষ হলে কী হবে, তলে তলে এই বাবাজি পেকে একদম ঝুনো হয়ে আছে।

সে কি মামুজান! উনি তো অন্য কথা বলছেন!

কী বলছেন?

বলছেন, এখনও নাকি শিশুই আছেন উনি। দুধের দাঁত এখনও পড়েনি।

ওড়নার আঁচলে মুখ চেপে হাসতে লাগলো নূরী। শূন্য কাপ-পিরিচ ট্রেতে তুলে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সোহাগী। তাকে ঠেলা দিয়ে নূরী বললো— দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছো কি? চলো —

www.boighar.com

সোহাগীকে ঠেলে নিয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল নূরী। মৃধা সাহেব হাঁক দিয়ে বললেন— আরে- আরে, আমার কিন্তু চা খাওয়া-এখনও হয়নি। আমার জন্য এখনই এক কাপ পাঠিয়ে দাও তো মা—

নূরী দূর থেকে বললো— আচ্ছা আচ্ছা, দিচ্ছি—

৪

যেতে লাগলো দিন। দিন দিন বাড়তে লাগলো থার্ডপণ্ডিত আমির রেজা সাহেবের খ্যাতি ও পরিচিতি। নূরীদের বাড়ি, তাদের পাড়াতে এবং স্কুলের পরিমণ্ডলে তার বিচরণ সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে এলো। নিজের অবস্থান পাকা হয়ে যাওয়ার পর আমির রেজা সাহেব চিঠি লিখতে বসলেন তাঁর ঢাকা নিবাসী সুহৃদ ও শুভাকাঙ্ক্ষী আবদুস সালামকে। তিনি লিখলেন—

প্রিয় সালাম,

বাদ তসলিম জানাই, এ্যাডভেঞ্চারের কথা শুনতে ও পড়তে বেশ ভাল লাগে। শীতের রাতে লেপের তলে শুয়ে থেকে টিভির পর্দায় সিন্দাবাদ বা রবিনসনক্রুসোর মতো কোন এ্যাডভেঞ্চারের ছবি দেখতে বড়ই আমোদ লাগে। মজা লাগে ঐ রকম একটা এ্যাডভেঞ্চারের নায়ক হিসেবে নিজেকে কল্পনা করতে। পুলক জাগে এমনই একটা এ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়ে পড়ার।

কিন্তু দোস্ত, কল্পনা আর বাস্তব একেবারেই আলাদা জিনিস। এ্যাডভেঞ্চারের কল্পনায় যত পুলকই থাক, বাস্তবে সে পুলক-ভুলোক ছেড়ে পালিয়ে যায় বারবার। কখনো বা প্রাণটাকেও নিয়ে যেতে চায় সাথে করে। তোমাদের উৎসাহে আর শিক্ষা অফিসার আফজাল আহমদ সাহেবের জুটিয়ে দেয়া এই এ্যাডভেঞ্চারে পা দিয়েই সেটা টের পেলাম হাড়ে হাড়ে। কয়েক শো মাইল দূরের এই প্রান্ত দেশে পৌঁছতে না পৌঁছতেই প্রাণ-আমার এমনভাবে বিপন্ন হলো যে, এ্যাডভেঞ্চারের পুলকের সাথে ইহ জীবনের খেলাটাও আমার খতম হয়ে যেতে বসলো চিরতরে। হঠাৎ করে আমার সেই বিপন্ন প্রাণটা যেভাবে রক্ষা পেলো, সেটাও একটা রীতিমতো মিরাকল। সেই সাথে ঐ বিপন্ন অবস্থার মধ্যেই বিনে ক্লেশে আবার বিনে চেষ্টায় যেভাবে আমি আমার গন্তব্যস্থলে আপছে আপ পৌঁছে গেলাম, সেটাও একদম ঐ আলিফ-লায়লা বরাবর জিনের পিঠে সওয়ার হয়ে পলকেই পরীর দেশে পৌঁছার মতো। সাদামাটাভাবে খাড়া করলেও এটা একটা আকর্ষণীয় গল্প হয়ে যায়। সাজিয়ে-গুছিয়ে খানিকটা রঙচং চড়ায়ে এটাকে অনায়াসে রোমান্সে ভরা একটা উপন্যাসে পরিণত করা যায়। আত্মকাহিনীভিত্তিক রোমান্টিক উপন্যাস। সে সব বর্ণনায় এখন যাবো না, সাক্ষাতে বলবো। কারণ, আত্মকাহিনী লিখতে আমি এখানে আসিনি, এসেছি পণ্ডিত করতে। এই পণ্ডিতিতে আমি যেন সফলকাম হই, এই দোয়া তেমার কাছে চাই।

কুশলে আছি। তোমাদের কুশলাদির অপেক্ষায়—

“আমির রেজা”-

চিঠিটা লিখতে রাত হলো অনেক। অনেক রাতে লিখতে বসায় আরো বেড়ে গেল রাত। পরের দিন সকালের দিকে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে নূসরত জাহান নূরী ডাক দিয়ে বললো— এই যে শুনছেন? আমাদের গরীবুল্লাহ মানে কিষান গরীবুল্লাহ অনেক রাত পর্যন্ত আলো দেখেছে আপনার ঘরে। ব্যাপার কি? অসুখে ধরলো নাকি আবার?

আমির রেজা সাহেব জেগেই ছিলেন। ফজরের নামাজ আদায় করে এসে বিছানায় শুয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছিলেন। নূরীর ডাকে তিনি ধড়মড় করে উঠে দরজার

কাছে এলেন এবং নূরীকে অসুখে ধরার কথা কী যেন বললেন? অসুখে ধরবে কেন?

ওড়নায় মাথা ঢেকে নূরী বললো— অনেক রাত পর্যন্ত আলো জ্বলছিল ঘরে আপনার। কারণ কী? হেরিকেন নেভাতে ভুলে গিয়েছিলেন বুঝি?

না-না, ভুলে যাইনি। আমি চিঠি লিখছিলাম।

চিঠি লিখেছিলেন? অত রাত পর্যন্ত?

হ্যাঁ, লিখতে-লিখতে রাতটা অনেকখানিই হয়েছিল।

মস্তবড় চিঠি বুঝি?

না, তেমন বড় নয়। তবু—

কোন প্রিয়জনকে লিখছেন নিশ্চয়ই?

হ্যাঁ, প্রিয়জন তো বটেই। প্রিয়জন, পরিচিতজন ছাড়া কি অন্যকে চিঠি লিখে কেউ?

রেজা সাহেব মৃদু হাসতে লাগলেন নূরীও মৃদু হেসে বললো, বেশ-বেশ। প্রিয়জন যে আপনার কেউ আছে সেটা খুব খুশির কথা।

কেন?

বাহঃ! সংসারে যার নিজের বলতে তেমন কেউ নেই, তার দু'একজন প্রিয়জন না থাকলে সে বেচারি বাঁচবে কী করে? অবলম্বন তো চাই একটা?

ও আচ্ছা, তা বটে।

মন খুলে কথা বলারও একজন কাউকে চাই। নইলে তো সে বেচারার দম আটকে যাবে।

জি-জি খুবই ন্যায্য কথা।

তা আপনার সেই প্রিয়জন কতদিনের পরিচিত জন আপনার?

আমার? অনেকদিনের। বাল্যকাল থেকেই আমরা দু'জন একসাথে মানুষ হয়েছি। খেলাধুলা লেখাপড়া সবই একসাথে করেছি।

ওমা! তাই নাকি? এই রকম প্রিয়জন?

হ্যাঁ, এই রকম। গভীর মেলামেশা।

মাটির দিকে চেয়ে নূরী ফের মৃদুহেসে বললো, তাহলে ওটাই বুঝি শেষ পর্যন্ত শাদিতে গড়াবে?

শাদি! কার?

আপনার।

কার সাথে?

ঐ যে চিঠি লিখছিলেন যাকে।

তাজ্জব। সে তো আমার বন্ধু! পুরুষ মানুষ!

এ্যা! তাই? ছিঃ—

—চমকে উঠে পালিয়ে বাঁচলো নূরী।

সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী কুন্তি সাঁওতালের মেয়ে। বেশ চটপটে আর পড়াশোনায় বেশ ভাল। চেহারাটা কালো হলেও মুখাকৃতি মনোরম। বেশবাসও পরিচ্ছন্ন। তার চেয়েও বড় কথা, বড় পরিচ্ছন্ন তার মনটা। একটা কঠিন সন্ধিবিচ্ছেদ অনেকের মধ্যে এক মাত্র সে-ই করতে পারায়, থার্ডপণ্ডিত রেজা সাহেব তার খুব প্রশংসা করলেন। বললেন, আরো কয়েকদিন লক্ষ্য করে দেখেছি, ব্যাকরণটা বেশ ভালই বুঝে তুমি। বেশ-বেশ সব সাব্জেকটই মন দিয়ে পড়ে, ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই একজন বড় পণ্ডিত হতে পারবে তুমি।

কুন্তি তখন কিছুই বললো না। চূপচাপ রইলো। কিন্তু ছুটির পর রেজা সাহেবকে একা পেয়ে কুন্তি কাছে এসে বললো—সাহেব? মাইয়া মানুষ ভি পণ্ডিত হইতে পারে ছার?

রেজা সাহেব বিস্মিতকণ্ঠে বললেন—কেন, এ কথা বলছে কেন?

কুন্তি বললো—ঐ যে ছার ক্লাসে হাপনি বুললেন, মুন লাগাইয়া পড়াছুনা করলে হামি পণ্ডিত হইতে পারবো? কিন্তুক হামি তো মাইয়া ছেইলা ছার, মাইয়া মানুষ বটেক।

খেয়াল হতেই রেজা সাহেব বললেন—ও হ্যাঁ-হ্যাঁ তা পারবে না কেন? এই দুনিয়ায় বড় বড় পণ্ডিত মেয়ে মানুষ অনেক আছে। সেদিন যে মাদাম কুরির গল্প তোমাদের পড়লাম। উনিও তো একজন মেয়ে মানুষ।

ছেটা ঠিক। কিন্তুক উহার ছব বড় ঘরের আর বড় ছহরের মাইয়া। গৈ-গেরামের মাইয়া পণ্ডিত হইবে ক্যামনে? গৈ গেরামে তো মাইয়া ছেইলার পড়াছুনার ছুযোগ নাই। ঢের অছুবিদা।

অসুবিধা। কেন?

হামার বহিন কৃছনা এহি স্কুলে পড়াছুনা করিত। ক্লাছ নাইনে উঠিয়াছিল বটে। কিন্তুক বেজায় অছুবিদা হইলো উসলিয়ে উহার পড়াছুনা আর হইলেক নাই বটে।

কেন-কেন? কী অসুবিধা।

: ছি বহুত কতা আছে। আখুন বুলা যাইবেক নাই ছার। পরে হামি বুলবো বটে।

আচ্ছা ঠিক আছে। তা তোমার বাড়ি কোন গ্রামে?

স্কুলের দক্ষিণ দিকের গ্রামটার প্রতি ইংগিত করে কুন্তি বললো— ছই ছার, ছই যে গেরাম, ওহি গেরামে।

ও, তাহলে তো নিকটেই।

বিলকুল লিকটে। আধা মাইল ভি হইবেক নাই বটে।

ওখানে কি শুধু তোমাদের স্বজাতিই বাস করে না আর কোন জাতিও ওখানে আছে?

হামরাই-হামরাই। হামাদের স্বজাতিই বেছি ছার। দু'চার ঘর বাবু লোগ ছাড়া বিলকুল হামরা।

ও আচ্ছা। তা তোমাদের গ্রামে একদিন বেড়াতে যাবো, ভাবছি।

আনন্দে নেচে উঠে কুস্তি বললো-যাইবেন ছার, সাচ্ যাইবেন? তাহলে চলিয়ে ছার, আজই চলিয়ে না হামার ছাথ?

রেজা সাহেব বললেন- না, আজ সময় নেই, অন্যদিন যাবো।

অন্যদিন কুন্দিন ছার।

সেটা তোমাকে আমি পরে বলবো। মানে, তোমাকে ডেকে নিয়েই যাবো।

বহুত-আচ্ছা ছার, বহুত আচ্ছা। হাপনি একজন সাচ্চা মানুছ আছেন ছার, বহুত ভাল মানুছ। হাপনি যাইবেন তো গেরামের ছুবাই বেজায় খুছি হইবে। হামার বাপ ভি বহুত খুছি হইবেক বটে।

কুস্তিকে সেই মুহূর্তে বিদায় করলেন বটে, কিন্তু কুস্তিদের গ্রামে যাওয়ার অগ্রহ রেজা সাহেব বেশি দিন চেপে রাখতে পারলেন না। একদিন পরেই ছিল হাফ স্কুল। দু'ঘণ্টা আগেই স্কুলের ছুটি হয়ে গেল। হাতে সময় পেয়ে রেজা সাহেব কুস্তিকে ডেকে বললেন-আজ অনেক খানি সময় হাতে পাওয়া গেল। আজ যদি আমি তোমার সাথে তোমাদের গ্রামে যাই, তোমার কোন অসুবিধে আছে?

আনন্দে লাফিয়ে উঠে কুস্তি বললো- অছুবিধে! নাই- নাই, কুয়ী অছুবিধে নাই। অছুবিধা থাকবে কেন? চলিয়ে ছার, চলিয়ে।

আমির রেজা সাহেব সত্যি সত্যিই সেদিন কুস্তির সাথে কুস্তিদের গাঁয়ের পথ ধরলেন। আর গল্লে গল্লে পথ চলতে লাগলেন। অপরিসীম আনন্দে উৎফুল্ল কুস্তির মুখে গল্লের খৈ ফুটতে লাগলো। সে তার গাঁয়ের কথা, গাঁয়ের লোকদের কথা, তার নিজের বাড়ি ও পরিবার পরিজনদের কথা এক নাগাড়ে বর্ণনা করে যেতে লাগলো। রেজা সাহেব তার বর্ণনা শুনতে লাগলেন এবং পথ চলতে চলতে চারদিকে দেখতে লাগলেন। দেখলেন, তাঁদের আগে পিছে আরো অনেক ছাত্রছাত্রী কুস্তিদের গ্রামের পথ ধরেছে। তা দেখে রেজা সাহেব কুস্তিকে প্রশ্ন করলেন-এরা কী সবাই তোমাদের গাঁয়ের ছেলেমেয়ে?

কুস্তি সোচ্চারকণ্ঠে বললো-ছবই-ছবই। দুই একজন ভিন্ন গেরামের হলেও, ছবই হামাদের গেরামের ছেইলা মেয়ে।

বাঃ! তোমাদের গ্রামের অনেক ছেলেমেয়ে এই স্কুলে পড়ে প্লেখি।

আরো জিয়াদা ছিল ছার। আখুন তো ছুধু ছেইলারা আর ছোট ছোট মেয়ে ছেইলা পড়িতে আসে। এর আগে বহুৎ বড় বড় মেয়ে ছেইলা পড়িতে আছিতো।

ছেইলামাইয়াতে-ই পথ ভরিয়া যাইবে রোকন

তাই? তাহলে এখন তারা আসে না কেন?

আসবেক নাই ছার। বড় বড় মেয়ে ছেইলা আর আসবেক নাই। বহুৎ অছুবিধা।

খেয়াল হতেই রেজা সাহেব প্রশ্ন করলেন-ও হ্যাঁ-হ্যাঁ। এই রকম কথাই সেদিন তুমি বলছিলে। তোমার বহিন-কী যেন নাম?

: কৃছনা ছার। কৃছনা রানি।

হ্যাঁ-হ্যাঁ কৃষ্ণা, কৃষ্ণা রানি। তা তার পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গেল কেন?

কুন্তি স্নানকণ্ঠে বললো-হইবে না কেনে ছার? হামরা ছোট জাত। হামাদের ইজ্জত তো ছব ছরকারি মাল। ছবাই হামাদের ইজ্জত ছিনাই লইতে চায়। তাই হামাদের মেয়ে ছেইলা বড় হই যাইবে তো জরুর তাকে পড়াছুনা বন্ধ করিতে হইবে। স্কুলে আছা চলবে না।

: কুন্তি!

: হামার বহিন কৃছনা ক্লাছ নাইনে উঠিল। ছাথ্ ছাথ্ যুবতী হই উঠিল। ব্যস্ অমনি ছবার লজর উহার উপর পড়িয়ে গেল। ছে স্কুলে আর টিকিয়া থাকিতে পারিলো না।

কেন, স্কুলে তার কোন অসুবিধে হলো কি?

: জি ছার, জব্বোর অছুবিধা হইল। অন্যের লজর তো উহার উপর পড়িলই, ছেই ছাথে-

বলতে গিয়ে কুন্তি থেমে গেল। রেজা সাহেব প্রশ্ন করলেন-থেমে গেলে যে? সেই সাথে কি?

: বুলা যাইবেক নাই ছার। বড় বুড়া বাত্ আছে। ছরম কা বাত।

: কী সে বাত, বলোই না।

ঘেন্নার কথা ছার। অন্যের লজর পড়িল তো পড়িল, স্কুলের ছারের লজর ভি বহিনের উপর পড়িল। চমকে উঠলেন রেজা সাহেব। বললেন-স্যারের নজর মানে? স্কুলের শিক্ষকদের?

কুন্তিও চমকে উঠে বললো-নেহি ছার, নেহি-নেহি। ছব ছার নেহি। এক আদমী বাদে, বাদ বাকি ছব্ ছার দেউতা (দেবতা) আদমী আছে। পয়গম্বর আদমী আছে। উহারাই মাইয়াদের মায়ের মুতো ছম্মান করে, বেটির মুতো দরদ করে। লেकिन এক ছার বহুৎ হারামি আদমী আছে। খতর নাক আদমী। উই বদমায়েছ্ ছব ছুময় হামার বহিনের পেছনে লাগিয়া রইলেক বটে।

রেজা সাহেব স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। বললেন-সেকী। কে সে? কোন্ স্যার?

আলেফ ছার, ওহি আলেফ মিয়া। একদিন তো স্কুলেই হামার বহিনের

ইজ্জত উক্ত ছয়তান ছিনাই লিতে গেল! বহিনের চিৎকারে বহুত লোগ ছুটিয়া আসিল আওর ইজ্জত উহার বাঁচিয়া গেল। ভরম্ বাঁচিয়া গেল। না বাঁচিলে বহিন হামার গলায় দড়ি দিত জরুর।

রেজা সাহেব সবিস্ময়ে বললেন—বলো কি! এর পরেও ঐ আলফ মিয়া এই স্কুলে আছে?

থাকবে, জরুর থাকবে। উহার খুঁটির জব্বোর জোর আছে ছার, উহার কুছু হইবে না।

হইবে না মানে। আমাদের হেডমাস্টার তো খুব শক্ত মানুষ। ঈমানদার লোক। দুষ্টের দমণে উনি তো ভয় পাওয়ার লোক নন? তার কাছে কি নালিশ করেছিলে তোমরা?

কুন্তি কুণ্ঠিতকণ্ঠে বললো ছিঃ ছিঃ ই নালিছ কি দেওয়া যায় ছার? তাহলে চারদিকে ছব জানাজানি হই যাইতো। হামার বহিনকে আর কেহু ছাদি করিতে চাহিতো না।

বলো কি! সেই জন্যে নালিশটাও দিলে না তোমরা!

: ফায়দা বেছি হইতো না ছার, ভরম্টাই যাইতো ছুধু।

অর্থাৎ?

ই ঘটনা চার বরছ আগের ঘটনা। তখন অন্য হেডমাস্টার ছিল আর ছে হেডমাস্টার ছিল ঐ আলফ মিয়াদের রিস্তেদার। আত্মীয় লোক। ফায়দা কি হইতো, বাতাইয়ে?

এঁয়া? তাই নাকি? তাহলে তো তোমার কথাই ঠিক।

সেই থাকি হামাদের জোয়ান মেয়ে ছেইলারা আর স্কুলে আছে না। লায়েক হইয়া যায় তো স্কুলে ছাড়িয়া দেয়।

: কুন্তি!

হামাকে ভি ছাড়িয়া দিতে হইবে ছার। হামার বাপ আখুনই হামার উপর চাপ জুড়িয়া দিয়াছে বটে।

সেকি!

www.boighar.com

আপনি হামার বাপকে থোরা সমঝাই দিবেন ছার। হামার কুয়ী মুসিবত হইবে না— ছি কথা বুঝাই দিবেন। হামি স্কুল ছাড়তি চাই না ছার।

আচ্ছা-আচ্ছা, তা আমি অবশ্যই বুঝিয়ে দেবো। কিন্তু এবার বলো তো, ব্যাপারটা কি? জানা জানি হওয়ার ভয়ে তোমরা নালিশ করোনি। কিন্তু অবস্থা দেখে বোঝা যাচ্ছে তোমার বোনের ঐ ঘটনা জানাজানি হয়ে গেছে। তা না হলে বড় বড় মেয়েদের স্কুলে আসা বন্ধ হয়ে যাবে কেন?

হ ছার, কুচ্ কুচ্ জানাজানি তো জরুর হই গেছে। ইছব কথা কি বিলকুল চাপা থাকে ছার?

হ্যাঁ তাই বলা।

কথায় কথায় রেজা সাহেব কুস্তিদের গাঁয়ে চলে এলেন এবং এক সময় কুস্তিদের বাড়ি এসে হাজির হলেন। কুস্তিদের বাড়িটা গাঁয়ের অনেকখানি ভেতরে। কুস্তিদের বাড়ি পৌছার পথে রেজা সাহেব যা লক্ষ্য করলেন তাতে এখনকার সাঁওতালদের সম্বন্ধে তার পূর্বধারণা অনেকখানি পাল্টে গেল? দেখলেন, কিছু কিছু গরিব সাঁওতালের বাড়ি দু'চারটে শূকর, হাঁসের পাল আর অন্যান্য গৃহপালিত জীব জানোয়ার নোংরা করে রাখলেও, এ গাঁয়ের অধিকাংশ সাঁওতালদের বাড়িই বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আরো লক্ষ্য করলেন, খুঁপড়ি-ছাপড়াওয়ালা গরিব সাঁওতালদের বাড়িও যেমন প্রচুর আছে গাঁয়ে, তেমনি অবস্থাপন্ন সাঁওতালদের বাড়িও আছে বেশ কিছু। অবস্থাপন্ন সাঁওতালদের ঘর দুয়ার সব টিনের আর উঠোন-আঙ্গিনা বেশ নিকানো-পোঁছানো রুচিসম্মত পরিষ্কার পরিবেশ। দু'চার ঘর গরিব সাঁওতালদের আঙ্গিনায় শূকরাদির গড়াগড়ি না দেখলে, এটা যে সাঁওতালদের গ্রাম, আমির রেজা সাহেব তা ধারণা করতেই পারতেন না। আরো লক্ষ্য করলেন, অবস্থাপন্ন অনেক সাঁওতালের বেশ বড় বড় খড়ের পালা আর গোয়ালভরা গরু। কুস্তি তাঁকে জানালো, এরা সবাই বড় কৃষক। মাঠে এদের এখনও জমি আছে অনেক।

কুস্তিদের বাড়ি পৌঁছে রেজা সাহেব আরো বেশি চমৎকৃত হলেন। অন্য আর কিছু না হোক, একটা জোতদারের বাড়ি এসে পৌঁছলেন বলে মনে হলো তাঁর। সম্পূর্ণ আলাদা পরিবেশ, সর্বত্র পরিচ্ছন্নতার উজ্জ্বল ছাপ। পুরাতন একটা দালান ঘরসহ ভেতর বাড়ি অনেকগুলো বড় টিনের ঘর। বাহির বাড়ি বিশাল বৈঠকখানা, পূজামণ্ডপ, প্রশস্ত আঙ্গিনা আর আঙ্গিনার চারপাশে গাঁদা দোপাটি জাতীয় অনেক ফুলের ঝাড়। একটু পরেই খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন বাড়ির মালিক, অর্থাৎ কুস্তির পিতা মাধব চাঁদ মোহন্ত এই গাঁয়ের সবচেয়ে বড় মাতবর। এককালে প্রায় ছয় সাতশ বিঘে জমি ছিল মাধব মোহন্তের বাপের। মাধব মোহন্তের আজও যা আছে, তাও প্রায় শ'এর কাছাকাছি।

রেজা সাহেব আরো যা জানলেন, তাহলো—এই মাধব মোহন্তের মতো ঠিক এতবড় না হলেও, এর কাছাকাছি আরো বেশ কয়েকঘর অবস্থাপন্ন সাঁওতাল আছে এই গাঁয়ে। এমন সাঁওতাল কিছু কিছু আরো আছে আশপাশের গাঁয়েও।

সবকিছু দেখে ও জেনে আমির রেজা সাহেব অনুধাবন করতে পারলেন সাঁওতাল বিদ্রোহের নেত্রী ইলামিত্রের আসল শক্তি নিহিত ছিল কোথায়। কাদের দ্বারা তিনি গরিব ও যাযাবর জাতীয় তামাম সাঁওতাল বুনোদের একত্র করতে পেরেছিলেন।

বাড়ি পৌঁছেই কুস্তি আগে রেজা সাহেবকে এনে বৈঠকখানায় বসালো এবং

তারপর উল্লাসভরে দৌড় দিয়ে ভেতরবাড়ি গেল। এরপর পলক কয়েকের মধ্যেই বাড়ির ভেতর থেকে কলরব করতে করতে ছুটে এলেন কুস্তির বাপ মাধব মোহন্ত, কুস্তির বোন কৃষ্ণা, অন্য কয়েকজন নারী, পুরুষ ও একপাল বাচ্চা-কাচ্চা। নতুন থার্ডপণ্ডিতকে দেখার আগ্রহে ছুটে এলেন সবাই।

বেশ কিছুদিন থেকেই সবাই এরা কুস্তির মুখে এস্তার শুনে আসছেন যে, কুস্তিদের নতুন থার্ডপণ্ডিত আমির রেজা সাহেব ঢাকা থেকে এসেছেন। রাজধানী ঢাকার লোক তিনি। তার চেয়েও অধিক শুনে আসছেন, এই নতুন থার্ডপণ্ডিত একজন সত্যি সত্যিই পণ্ডিত মানুষ, বাংলায় অগাধ তাঁর জ্ঞান। এর উপর তাঁর চেহারা দেউতার (দেবতার) মতো, দেউতার মতো চরিত্র, সান্না-দিলের পবিত্র-মানুষ তিনি। কুস্তিসহ সকল ছাত্রছাত্রীর প্রতি অশেষ তাঁর স্নেহ আর অনাবিল তাঁর আচরণ। তাঁকে দেখলে দেউতা দর্শন হয়ে যায়।

কুস্তির মুখে অবিরাম আর অনর্গল এইসব তারিফ শুনেশুনে থার্ডপণ্ডিতকে দেখার ইচ্ছা সকলের মনেই জাগ্রত হয়। অতঃপর পণ্ডিত সাহেব তাদের গাঁয়ে বেড়াতে আসবেন একদিন— এ কথা শুনে সবার সে আগ্রহ প্রচণ্ড হয়ে ওঠে। তিনি আজ সত্যি সত্যিই এসেছেন শুনে হস্তদস্ত হয়ে ছুটে এলেন সবাই।

কুস্তির পিতা মাধব মোহন্ত সাদাসিধে ও সদালাপী মানুষ। বয়স ষাটের কাছাকাছি। তিনি এসে দুই হাত জোড় করে কপালে ঠেকালেন এবং বললেন— নমস্কার বাবু ছাহেব, নমস্কার। হামি কুস্তির বাপ আছি বটে। নাম হামার মাধব মোহন্ত।

“বহুত আচ্ছা— বহুত আচ্ছা”, বলতে বলতে রেজা সাহেব উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁর সাথে করমর্দন করলেন। এরপর বললেন— আমি কুস্তিদের স্কুলের নতুন থার্ডপণ্ডিত। আমার নাম আহমদ আমির রেজা। মাধব মোহন্ত, খোশকণ্ঠে বললেন— বহুন-বহুন। হামি আপনার কতা ছব শুনিয়াছি। আজ হামার দেউতা দরছন হই গেল বটে।

রেজা সাহেব শরমিন্দাকণ্ঠে বললেন— ছিঃ ছিঃ! ও কথা বলতে নেই। আমি কোন দেবতা-ফেরেশতা নই, নগণ্য একজন মানুষ আমি।

রেজা সাহেবের পাশে বসতে বসতে মাধব মোহন্ত, বললেন— হউক-হউক, মানুষই ভি দেউতা আছে। দিল সাফা হোবে, মন সান্না হোবে আউর দেউতা মাফিক ছুভাব হোবে তো উও আদমী বিলকুল দেউতা। হামার কুস্তির মুখে হামি ছব শুনিয়াছে। উও বেটি কভ্ভি বুটা বাত্ বলে না।

রেজা সাহেব হেসে বললেন— বুটা না বলুক, কুস্তি অনেকখানি বাড়িয়ে বলেছে। ও আমাকে খুব শ্রদ্ধা করে তো।

নেহি-নেহি, কুচু বাড়িয়ে বলে নেহি। হামরা ছোটা জাত। কুয়ী বাবুলোগ হামাদের মকানে আছিতে চায় না। আপ বহুত বড়া বাবু লোগ, বড়া আদমী, ঢাকাছে আয়া হয়। আপ হামার মকানে আপছে আপ চলিয়া আসিলেন। ইয়ে

বাত্ কুয়ী মামুলী বাত নেহি। আপ জরুর দিলওয়ালা আদমী আছে। আপকা দিল বহত বড়া আছে বটে।

মোহন্ত জি!

ই দুনিয়ায় সান্চা মানুছ পাওয়া বহুৎ ভার আছে বাবু ছাহেব। সান্চা মানুছ পাওয়া যাইবে তো উহারে শ্রোদ্ধা-সুন্মান করতে হবে জরুর। হামার বেটি কুন্তি ঠিক বাত্ বলিয়াছে বটে।

রেজা সাহেব ততমত করে বললেন- তা কথা হলো-

মাধব মোহন্ত বললো- ও বাত্ আভি ছাড়িয়া দিন বাবুজি। ইবার হাপনার কতা বলুন। হাপনার মকান ঢাকা ছহরে হ্যায়, না?

হ্যাঁ- হ্যাঁ ঢাকা শহরে।

হাপনার বহুৎ খোশনসীব আছে বাবু ছাহেব। ঢাকা ছহর জবেবার ছহর আছে বটে। বহুৎ নাম। লেকিন উও ছহর হামি কভ্ভি দেখলেক লাই।

আমিও আপনাদের এ অঞ্চলে আগে কখনো আসিনি। তাই এ অঞ্চলটা ঘুরে-ফিরে দেখার আমার বড় শখ। আর সে জন্যই আজ আপনাদের এখানে এসেছি। মানে, এ এলাকার লোকদের সাথে পরিচিত হতে এসেছি।

বহুত আচ্ছা-বহুত আচ্ছা। তব্ আগারী হামাদের ছাথে পরিচিত হইয়া যান—

বলেই তিনি উপস্থিত লোকজনের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন- ই-ছব হামার ভাই বেরাদর, রিস্তেদার আওর ছেইলা মাইয়া আছে বটে। এই যে, ইয়ে লেডুকী হামার বড় মাইয়া ক্ছুনা। ক্ছুনা রানী। এলেমদার মাইয়া। আয় মা ক্ছুনা কাছে আয়। বাবু ছাহেবকে সেলাম দে—

মোহন্তজি কৃষ্ণাকে কাছে ডাকলেন। কৃষ্ণা কাছে এসে হাত তুলে বললো- সেলাম ছার।

রেজা সাহেব হাত তুলে বললেন- সেলাম!

এরপর কৃষ্ণার মুখের দিকে চেয়ে ক্ষণিকের জন্যে তিনি আনমনা হয়ে গেলেন। কি এক বিচিত্র সৌন্দর্য। কৃষ্ণার গা-পা সবই কৃষ্ণ বর্ণের। চুলটা আরো অধিক কালো। তবু কি এক মনোরম চেহারা। অন্ধকার রাতের মতো চুলগুলো তার আজানুলম্বিত। আয়ত নয়ন। খোদাই করা নাক, মুখ, ঠোঁট ও চিবুক। ঝকঝকে দাঁত, নিটোল স্বাস্থ্য।

কৃষ্ণার এই অনবদ্য মুখাকৃতি দেখে রেজা সাহেব ভাবতে লাগলেন, ভাল মানুষেরই নজর কাড়ার মতো মুখাকৃতি এটা, লম্পটদের নজর তো কাড়বেই। এই কেশ আর মুখাকৃতির সাথে কৃষ্ণার বর্ণটা যদি গৌড় বর্ণ হতো, তাহলে আরো কতটা যে আকর্ষণীয় হতো এই চেহারা- তা অনুমান করা কঠিন।

রেজা সাহেবকে নীরব দেখে মাধব মোহন্ত, বললেন- হামি বে-এলেম আদমী

বাবু ছাহেব, লেকিন হামার বেটি এই কৃছনা এলেমদার বেটি আছে বটে। জিয়াদা এলেমদার। হাপনে ভি এলেমদার আদমী। হামার কৃছনার ছাথে বাত্চিত্ করুন, আরাম পাইবেন।

রেজা সাহেব কৃষ্ণাকে প্রশ্ন করলেন— আপনার নাম কৃষ্ণারানী? আপনি কুস্তির বোন?

ধীর অথচ সাবলীলকণ্ঠে বাধা দিয়ে কৃষ্ণা বললো— না ছার, না-না, আমাকে আপনি আপনি বলবেন না। উতে আমার গুনাহ হবে বটে।

www.bighar.com

রেজা সাহেব বললেন— গুনাহ হবে? কেন?

কৃষ্ণা বললো— আপনি যে স্কুলের এখন ছিফক আছেন, কিছু দিন আগে ঐ স্কুলেরই ছাত্রী ছিলাম আমি। আমি আপনার ছাত্রী মাফিক আছি বটে। আমাকে ‘আপনি’ বলবেন কেন? এটা বড়ই বেমানান।

তার কথা শুনে রেজা সাহেব খুশি হয়ে বললেন— তাই? আচ্ছা-আচ্ছা, তোমাকে তুমিই বলবো। কিন্তু তুমি তো বেশ ভাল বাংলা বলতে পারো দেখছি। বেশ শুদ্ধ আর শুদ্ধ উচ্চারণ।

: না ছার, জিয়াদা ছুদো বলতে পারি না। জনমগত কি ছহজে ছাভাবিক যায় ছার? এক মাছ পরেই ক্লাছ নাইন পাছ করিতাম। বহুৎ কোছেছ করেও তবু ছব ছদের উচ্চারণ ছুদো করিতে পারিলাম না।

কৃষ্ণার কণ্ঠে আক্ষেপ। রেজা সাহেব উৎসাহ দিয়ে বললেন— যা করেছো তাই বা কম কী? আর কিছু দিন স্কুলে গেলেই অবশিষ্ট জড়তাটুকু কেটে যেতো। কিন্তু—

কৃষ্ণা নিঃশ্বাস চেপে বললো— কিন্তু তা আর হইলো না ছার। ছব আমার কুপাল।

হ্যাঁ, সে কথা কিছু আমি শুনেছি। তবে সে দিনের অবস্থা আজ আর নেই। কড়া শাসন প্রতিষ্ঠা হয়েছে স্কুলে এখন। কারো দিকে নজর তুলে তাকাবার সাহস আজ আর কারো নেই— তা সে যতবড় লোকই হোক।

কুস্তির মুখে আমি ই কতাও ছুনিয়াছি বটে। কিন্তু আর স্কুলে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়।

মাধব মোহন্ত এই সময় প্রতিবাদের সুরে বলে উঠলেন— লাই বাবু ছাহেব, লাই। কৃছনা আউর স্কুলে যাইবেক লাই। উহারে আখুন হামি ছাদি দিবেক বটে। ছোব ঠিক-ঠাক।

রেজা সাহেব বললেন— ও আচ্ছা। তা মোহন্তজি, কুস্তির তো এখনও শাদির বয়স হয়নি। তার পড়াশোনা বন্ধ করতে চাইছেন কেন? এখন তো স্কুলে কোন উচ্ছৃঙ্খলতা নেই। শক্ত শাসন চলছে। সবাই এখন কম্পমান। দয়া করে কুস্তির পড়াশোনাটা বন্ধ করে দেবেন না।

মাধব মোহন্তু সখেদে বললেন- ছি কতা কি বুলবো বাবুজি? ঘরপুড়া গরু হামি। ছিন্দুরে মেঘ দেখি জব্বোর ডরাই বটে।

: না-না, আর কোন ডরানোর কারণ নেই। অন্তত আমি যত-দিন ঐ স্কুলে আছি, ততদিন আপনি নিশ্চিন্তে কুন্তিকে স্কুলে পাঠাতে থাকুন। কুন্তির দায়িত্ব আমার উপর ছেড়ে দিন। ওর নিরাপত্তা নিজে আমি দেখবো।

খতমত খেয়ে মাধব মোহন্তু বললেন- বাবু ছাহেব।

রেজা সাহেব আরো বললেন- তা ছাড়া বর্তমান হেডমাস্টার সাহেবও শক্তনীতির সাক্ষা মানুষ। তাঁর উপরও বিশ্বাস রাখতে পারেন আপনি। স্কুলে যাওয়া বন্ধ করার কথায় কুন্তি বড় দুঃখ পায়। ও কথা দয়া করে আর বলবেন না।

: বুলবো না?

: না মোহন্তুজি। কুন্তির কাছে ও কথা বড় দুঃখের কথা। ও কথা আর বলবেন না।

মাধব মোহন্তু এবার সজোরে নড়েচড়ে উঠলেন। মুক্তকণ্ঠে বললেন- ঠিক হয় বাবুজি, ঠিক হয়। আওর উ কুতা হামি বুলবেক লাই। হাপনার লির্দেছ দেউতার লির্দেছ আছে। দেউতার লির্দেছ মানবেক লাই তো আখেরে পুস্তাতে হোবে বটে।

না-না, এটা আমার নির্দেশ নয় মোহন্তুজি। আমার অনুরোধ। কুন্তি খুবই মেধাবী মেয়ে। বেশি পড়াশোনা করার সুযোগ পেলে ও আপনার বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে। আপনার স্বজাতির মুখ উজ্জ্বল করবে।

: সাচ্ বাত ছাহেব?

এ কথা আমি প্রায় হলপ করেই বলতে পারি।

কেয়া বাত্- কেয়া বাত্। তু দেখিয়ে লে কুছনা, ইয়ে বাবু ছাহেবকো দীল বিলকুল দেউতার দীল আছে। ইহার বাত্ হ্ল্ফিল্ ছরগের.বাত্। ইহার ছাখে বাত্চিত্ করিবে। তো দীল সাফা হই যাইবেক আওর এলেম ভি বাড়তি হই যাইবেক, হঁ।

আমির রেজা এই সময় চঞ্চল হয়ে উঠে বললেন, ওহো বেলাতো একদম পড়ে গেল। আপনাদের গ্রামটা আমার কিছই দেখা হলো না। আমি উঠি।

উঠিবেন?

: জি। আর তো সময় বেশি নেই। অন্তত আপনাদের এই পাড়াটা ঘুরে ফিরে আজ একটু দেখে-যাই। পরে আবার আসবো।

আছিবেন-আছিবেন, হররোজ আছিবেন।

আসতে আমাকে হবেই মোহন্তুজি। আপনাদের সমক্ষে জানার যে অনেক খায়েশ নিয়ে আমি এখানে এসেছি।

কৃষ্ণা প্রশ্ন করলো— আমাদের ছস্কে জানার মানে? আমাদের ছস্কে কী জানতে চান?

রেজা সাহেব বললেন— আপনাদের সস্কে—

কৃষ্ণা বাধা দিয়ে বললো— ফের আপনাদের?

খেয়াল হতেই রেজা সাহেব সংশোধন করে বললেন— সরি, তোমাদের। তোমাদের জীবনযাত্রা, ধর্মীয় দিক, আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিক রীতিনীতি-সবকিছু। আমরা ঢাকার লোক। তোমাদের সস্কে তো আমরা তেমন কিছু জানিনে। তাই আমার মাধ্যমে ঢাকার লোকেরা তোমাদের কথা জানতে চায়। এখানে আসার সময় তারা আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছে।

: তাই?

: হ্যাঁ। এতদিন তো অনেকেই তোমাদের অবহেলা করে এসেছে। এখন আর কেউ করতে চায় না। ছোট-বড় সব জাতির মানুষকেই সভ্য মানুষেরা এখন সম্মান করতে চায়। সবার প্রতিই দরদ দেখাতে আগ্রহী। কিন্তু তোমাদের সস্কে কিছাই না জানলে সেই দরদটা তারা দেখাবে কি করে, বলা?

আপনার মুখে ছুনলেই তারা ছেই দরদ দেখতি ছুরু করবে?

: না, তা কি হয়। নানা মুখে শুনতে শুনতেই একদিন তারা তোমাদের সবকিছু জানতে পারবে। তোমাদের দুঃখ-দৈন্য বুঝতে পারবে। ঢাকার লোকের সাথে তামাম দুনিয়ার লোকও দিনে দিনে চিনতে পারবে তোমাদের। তোমাদের নিয়ে ভাববে।

ছার।

: আমি যেটুকু পারি আর যে কয়জনকে পারি তোমাদের কথা বলি। এইভাবে বলতে বলতেই একদিন সবাই জানতে পারবে তোমাদের। বুঝতে পারবে তোমাদের জীবনযাত্রা। তোমাদের সম্মান করতে শিখবে।

: বহুৎ আচ্ছা বাত্ বটে। লেकिन আমাদের জীবনযাত্রা, ছমাজ, ধরম— ই ছব একেলা ঘুরিয়া আপনি ছমঝিয়া লিবেন ক্যামনে ছার? আপনাকে ছে ছব ছমঝিয়ে দেয়ার আদমী তো কুয়ী থাকতি হবে আপনার ছাথে?

রেজা সাহেব সরবে বললেন— হ্যাঁ-হ্যাঁ, সেটা তো বিশেষ জরুরি। কিন্তু সে মানুষ আমি পাই কোথায় বলা? এটা আমার বিদেশে বিড়ুই। চেনাজানা কেউ নেই।

: তাই? আচ্ছা ঠিক আছে। আজ তাহলে আমি আপনার ছাথে থাকবেক বটে। এই পাড়াতে আপনার ছাথ-ছাথ আজ আমি ঘুরিবো আওর ছব ছমঝাই দিবো— ঠিক হ্যায়?

মাধব মোহন্ত, এ কথায় জোর সমর্থন দিয়ে বললেন— বিলকুল ঠিক। ওহি কাম তু করিয়া দে কৃছনা। বাবু ছাহেব কো মদদ দে। পুণিয়ার কাম হইবেক বটে।

রেজা সাহেব উঠে পড়েছিলেন। কৃষ্ণ বললো— আছুন ছার, হামার পিছে পিছে আছুন। আজকের কাম আমি করিয়া দিই। পরে যখন আছিবেন তখন একঠো মজবুত লোগ আপনাকে জুটাই দিবো, ঠিক-ঠিক।

সেদিন কৃষ্ণ রেজা সাহেবকে নিয়ে তাদের পাড়ার বাড়ি কয়টা ঘুরে ঘুরে দেখালো। পাড়ার লোকদের সাথে রেজা সাহেবের পরিচয় করে দিলো। অনেকের সাথে অনেক কথাবার্তাও বললো। অবশেষে বললো— একদিনে তো ছব জানতি পারিবেক নাই ছার। আওর বহুতদিন আপনাকে আসিতে হইবে বটে। তবেই আমাদের ছমাজ, ধরম, আচার, নিয়ম ছব ঠিক ঠিক বুঝিয়া লইতে পারিবেন।

রেজা সাহেব বললেন— আসবো-আসবো, সময় করতে পারলে নিশ্চয়ই চলে আসবো। তোমরা আমাকে একটা লোক ঠিক করে দেবে।

ছে কতা তো আপনাকে বলিয়া দিয়াছিই বটে। আপনি চলিয়া আসিবেন, ছে ব্যবস্থা আমি করিয়া দিবো আলবত্।

সেদিনের মতো ফিরে এলেন আমির রেজা। বেলা হাতে না থাকায় বেশি বাড়িতে যাওয়া সেদিন হলো না। এর পরে অল্পদিনের মধ্যেই পরপর আরো দুইবার এলেন রেজা সাহেব। কিন্তু খবর দিয়ে আসতে না পারায় কৃষ্ণারা প্রথমদিন তাৎক্ষণিকভাবে একজন অদক্ষ ও অজ্ঞ লোক যোগাড় করে দিলো। তাকে দিয়ে কোন কাজ না হওয়ায় হতাশ হলেন রেজা সাহেব। দ্বিতীয় দিনে কৃষ্ণারা কোন লোকই দিতে পারলো না। কৃষ্ণা সেদিন দুঃখ করে বললো— দক্ষলোক আজও পাইলাম না ছার। যাদের পাইলাম ছবই অকেজো আদমী। দুদিন পরে আছবেন তো জব্বোর কাজের লোক পাওয়া যাইবেন একজন। উহারে আমি আগারী ঠিক করিয়া রাখিবো জরুর।

এতে করে আর যাই হোক পরপর এই তিনদিন মাগরিবের আগে আমির রেজা সাহেব নূরীদের বাড়িতে ফিরে আসতে পারলেন না। মাগরিবের নামাজগুলো পথেই আদায় করতে হলো তাকে।

অবশেষে এটা নজরে পড়লো অনেকের। স্কুল থেকে ফিরে এলেই চা-নাশতা দেয়া হয় রেজা সাহেবকে। ইদানীং চা-নাশতা নিয়ে এসে কাজের মেয়ে সোহাগী মাঝে মাঝেই সেগুলো ফেরত নিয়ে যেতে লাগলো। তা দেখে ব্যাপারটা কি তা জানার জন্যে আগ্রহী হয়ে উঠলো নূসরত জাহান নূরী।

শেষের দিন রেজা সাহেব সন্ধ্যার পরে ঘরে এলেই সোহাগীকে সাথে নিয়ে তার ঘরে এলো নূরী। এসেই সরসরি প্রশ্ন করলো— ঘটনাটা কী? আজকাল স্কুল রাত পর্যন্ত চলে নাকি।

প্রশ্নটা হালকাভাবে নিয়ে রেজা সাহেব বললেন— না-না, তা চলবে কেন?

তাহলে ফিরতে আপনার রাত হলো কেন?

এই অমনি অমনি। ছুটির পর একটু এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ালাম তো, তাই রাত হয়ে গেল।

না খেয়েই ঘুরে বেড়ালেন?

না খেয়ে কেমন?

নাশতা-পানি, আবার কী? সারাদিন স্কুল করার পর পেটে কিছু দিতে হয় তো। নাকি আজকাল সেটাও লাগে না আপনার?

: লাগে-লাগে। কিছু না কিছু মুখে তো দিতেই হয় জরুর।

: সেই কিছু না কিছুটা কোথা থেকে জোটে? কান্দুর মিয়ার দোকান থেকে নাকি মানে, স্কুলের পেছনে ঐ বাজারের পাশে?

রেজা সাহেব হেসে বললেন— জি-জি। যেদিন সময় মতো ফিরে আসতে পারিনি, সেদিন ঐ কান্দুর মিয়ার দোকানেই চা-টা খেয়ে নিই।

এ বাড়ির চা-টার চেয়ে কান্দুর মিয়ার দোকানের চা-টাই খুব মধুর লাগে বুঝি?

আরে দূর, তাই কি লাগে? কার সাথে কার তুলনা। ওটা অগত্যার ব্যবস্থা আর কি?

নূরী বিস্মিতকণ্ঠে বললো— অগত্যার ব্যবস্থা। কি এমন ঘাড়ভাঙা দায় পড়ে গেল যে, আপনাকে আজকাল অগত্যার ব্যবস্থা করতে হয়?

: না-না, কোন দায়টায় নয়। অমনি অমনি। ছুটির পরে যেদিন ফেরার ইচ্ছে হয় না, সেদিন চা-টা ওখানেই খেয়ে নিই।

কেন, ফেরার ইচ্ছে হয় না কেন?

: ইচ্ছে হয় না মানে, ফিরে এসে তো চুপচাপ একাকী বসে থাকা। কোন কাজ নেই। তাই—

: কাজ নেই কে বললে? করলেই কাজ থাকে। চুপচাপ বসে থাকতে হয় না।

তাই নাকি? কী কাজ?

আর না হোক, আমার ভাই ঐ রকিবুল হাসানটাকে একটু পড়াতে পারেন। বাংলা ব্যাকরণের শব্দ শব্দ জিনিসগুলো একটু বুঝিয়ে দিতে পারেন।

কি যে বলেন! রকিবুল হাসান সবে ক্লাস থ্রিতে উঠেছে। কঠিন কঠিন বিষয়গুলো এখনই ও বুঝবে কি? আর তাছাড়া ওতো আমার কাছে পড়তেই চায় না। বলে, মামুজান আমাকে পড়ান, আমি মামুজানের কাছে পড়বো। অন্য কারো কাছে পড়তে আমার ভাল লাগে না।

: তা অবশ্য ঠিক। ও ঐরকমই। ঐ একটা তার গৌ। আমার কাছেও পড়তে চায় না। তা সে কথা থাক। স্কুলের ছুটির পর যেদিন ফিরে আসতে ইচ্ছে হয় না, সেদিন কী করেন? যার-তার সাথে আড্ডা মারেন নাকি?

জি না-জি না। এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াই। এখানে আমি নতুন তো? আপনাদের এ অঞ্চল আগে কখনো দেখিনি। তাই কাছে কোলের এপাড়া সেপাড়া আর এ-গাঁ, সে-গাঁ একটু ঘুরে বেড়াই। মানে, ঘুরে ঘুরে দেখি।

ওরে বাবা, এষে দেখছি আর এক ইবনেবতুতা। তা কয়টা গাঁ ইতোমধ্যে ঘুরে বেড়ানো হলো?

আরে কয়টা গাঁ কি বলছেন? একটা গাঁ-ই এখনো সারা করতে পারিনি। গত তিনদিন ধরে একটা গাঁয়েই ঘুরছি, কিন্তু নানা কারণে ওটাই দেখা সারা হয়নি।

: বলেন কি! তিনদিনে একটা গাঁ দেখে সারা করতে পারলেন না? কোন গাঁ সেটা?

ঐ যে নিকটেই। স্কুলের দক্ষিণ দিকে ঐ যে সাঁওতালদের গাঁটা, ওটাই।

ঐ গাঁয়েই গত তিনদিন ধরে যাচ্ছেন?

: জি-জি, ওখানেই। ওখানে ঐ মাধব মোহন্তের পাড়াটাই ঘুরে দেখেছি একটু। অন্য দিকে যাওয়াই হয়নি।

এ কথায় নূরী সচকিত হয়ে উঠলো। রেজা সাহেবের মুখের দিকে স্থির নয়নে চেয়ে সে প্রশ্ন করলো— মাধব মোহন্তের পাড়াটাই ঘুরেছেন?

হ্যাঁ, ওটাই ঘুরেছি?

মাধব মোহন্তের বাড়িতে যাননি?

জি, গিয়েছি।

এ্যা! গিয়েছেন? কয়বার গিয়েছেন?

প্রতিদিনই। এই তিনদিন ধরে তো ওখানেই যাচ্ছি কেবল।

নূরীর চোখের জ্ব কুঞ্চিত হলো। প্রশ্ন করলো— তিনদিন ধরে ওখানেই যাচ্ছেন? ঐ একটা বাড়িতেই?

জি-জি, অন্য গাঁয়ের উপর আমার তেমন কোন আকর্ষণ নেই। সাঁওতালদের গাঁ আর তাদের জীবনযাত্রাটা দেখাই আমার যা শখ।

তাহলে মাধব মোহন্তের পরিবার পরিজনদের সাথে পরিচয় হয়েছে নিশ্চয়ই?

জি, তা হয়েছে।

মাধব মোহন্তের মেয়ে কৃষ্ণাকে কি দেখেছেন?

দেখেছি।

কথা হয়েছে তার সাথে?

হয়েছে।

অল্প অল্প, না বেশি বেশি?

বেশি বেশি। খুবই বেশি বেশি। ঐ কৃষ্ণাই তো ওখানে আমার একমাত্র

অবলম্বন। ঐ গাঁটা দেখার জন্যে ওর সাহায্যই নিতে হচ্ছে আমাকে।

অর্থাৎ সবসময় ওর সাথে ওঠাবসা করছেন আর ওর সাথে সাথে থাকছেন?
জি-জি।

নূরী নীরব হলো। পরে গম্ভীরকণ্ঠে বললো— হুঁউ, বুঝেছি।

জি?

কেন আপনি তিনদিন ধরে ঐ একই গাঁয়ে আর ঐ একই বাড়িতে যাচ্ছেন, তা বুঝেছি।

এবার রেজা সাহেবও মুখ তুলে বিস্মিতকণ্ঠে বললেন— কী বুঝেছেন?

জবাবে নূরী চাঁছাকণ্ঠে বললো— যা বোঝা স্বাভাবিক, তাই বুঝেছি। কৃষ্ণা আপনাকে যাদু করেছে।

জাদু করেছে মানে?

: আপনার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে। ওর ঐ মনমোহিনী চোখ-মুখ দেখলে আর ঐ মিষ্টি মুখের মিষ্টি কথা শুনলে যে কোন পুরুষেরই মাথা বিগড়ে যায়। আপনারও তাই গিয়েছে।

তাজ্জব! একি বলছেন?

মিথ্যা বলছি কি কিছুর? কৃষ্ণার মুখ কি মন কাড়ার মতো নয়?

: জি! সত্যি কথা বললে সেটা আমাকে স্বীকার করতেই হবে। তার মুখটা সত্যিই আকর্ষণীয়। কিন্তু একজনের আকর্ষণীয় মুখ দেখলেই ঘুরে যাবে মাথা আমার— এ ধারণা হলো কী করে আপনার?

: কী করে আবার হবে? ঐ মন ভোলানো মুখের দিকে সবসময় চেয়ে থাকলে, মনটাতো লাচার হওয়া স্বাভাবিক?

হ্যাঁ, সবসময় ঐ মুখ দেখা নিয়ে মশগুল থাকলে, তা হতেও পারে। কিন্তু আপনি তো জানেন, যত সুন্দরই হোক, কারো মুখের দিকে সবসময় চেয়ে থাকা আমার স্বভাব নয়। আপনার মুখও কম সুন্দর নয়। কিন্তু মিথ্যা না বললে আপনাকে এটা স্বীকার করতেই হবে যে, হঠাৎ করে চোখে পড়া ছাড়া, আপনার মুখের দিকে কখনো ইচ্ছে করে চেয়ে থাকিনি আমি।

তবু বেআব্রু দেখলে নাকি মূনির মনও টলে। ওদের তো পর্দা-আব্রুর বলাই নেই। পারে তো সর্বাঙ্গই খুলে রাখতে চায় তারা। রূপটাকে তারা ঐভাবে মেলে ধরতে চায়। এতে করে ওরা নিজেরাও মরে, অন্যকেও মারে।

জি?

সাবধান। পঞ্জিত করতে এসে জাত দেবেন না যেন?

এবার মুখটিপে হাসতে লাগলো নূরী।

সেটাতে গুরুত্ব না দিয়ে রেজা সাহেব অন্য প্রসঙ্গে গেলেন। নূরীকে প্রশ্ন করলেন— কি ব্যাপার! কৃষ্ণার সাথে আপনার বিশেষ পরিচয় আছে বলে মনে

হচ্ছে? ওকে চেনেন নাকি?

নূরী স্মিতহাস্যে বললো— ও আমার ক্লাসফ্রেণ্ড।

যারপর নাই বিস্মিত হলেন রেজা সাহেব। বিস্মিতকণ্ঠে বললেন— সে কি!
আপনার ক্লাসফ্রেণ্ড?

হ্যাঁ ক্লাস থ্রি থেকে নাইন পর্যন্ত আমরা একসাথে পড়েছি।

বলেন কি! তাহলে তো কৃষ্ণাকে শুধু চেনেনই না, ওর অনেক কথাই
জানেন।

: জানি! ঐ বদমায়েশ আলেফ মিয়ার অপকাণ্ড পর্যন্ত ওর অনেক কথাই
জানি। ওর প্রতি আপনাদের স্কুলের শিক্ষক আলেফ মিয়ার আচরণের কথাটা কি
শুনেছেন কিছু?

জি, কিছু কিছু শুনেছি। কিন্তু তারপরও ঐ আলেফ মিয়া এই স্কুলে রইলো
কী করে?

: রইলো কি করে, সে কথা পরে। আগের কথা— দোষটা তো আলেফ মিয়ার
একার নয়। আলেফ মিয়া একজন নিন্দুক, হিংসুক আর উচ্ছৃঙ্খল লোক হলেও,
কৃষ্ণার দোষ আছে অনেকখানি।

কী রকম?

: স্কুলের ছুটি হওয়ার পরও, ঐ ফাঁকা স্কুলে একা একা বসে থাকা উচিত ছিল
না তার। এ ছাড়া ঐ যে বললাম, অল্প কাপড়-চোপড় পরে ওরা রূপ-যৌবন
মেলে ধরে রাখে। সেজেগুজে এসে সেদিনও তাই ছিল। এই অবস্থায় হঠাৎ করে
আলেফ মিয়ার চোখে পড়ে গেল। আলেফ মিয়ার মতো একজন অসৎ চরিত্রের
লোক কি এই সুযোগ ছাড়ে? তার মাথায় তো ভূত চেপে যাবেই।

বলেন কী? তা কৃষ্ণা সেদিন কী কারণে বা কার অপেক্ষায় ঐ ফাঁকা স্কুলে
বসেছিল, তা কী কিছু জানা গেছে?

: না, সেটা জানা যায়নি। তবে যে আলেফ মিয়ার অপেক্ষায় নয়, সেটা
নিশ্চিত। নিদারুণ ঐ হৈ-চৈ এর পর কৃষ্ণা সেই যে স্কুল ছাড়লো, আর সেকথা
জানা যায়নি।

খুবই হৈ-চৈ হয়েছিল কী?

হয়েছিল বই কী! তবে আশপাশে প্রচুর লোকজন থাকায়, বদমায়েশটা
কৃষ্ণার কোন ক্ষতি করার সুযোগ পায়নি। কৃষ্ণার চিৎকারে হৈ-হৈ করে প্রচুর
লোক ছুটে আসায় বদমায়েশটা তখনই প্রাণের ভয়ে পালিয়ে যায়।

তাজ্জব! একজন শিক্ষক এমন কাণ্ড করার পরও শিক্ষকতায় থাকে কী
করে? তার ঐ আচরণের কোন প্রতিকার হলো না?

হয়েছে। তবে গুরুপাশে লঘুদণ্ড হয়েছে। মাস তিনেক স্কুল থেকে বহিষ্কার
করে রাখার পর অনেক তওবা-কছম আর প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে আবার ওকে

স্কুলে ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

এটা কী কোন প্রতিকার হলো?

এর বেশি আর হবে কি? তখনকার হেডমাস্টার ছিলেন ওর আত্মীয়। তার উপর স্কুলের মাঠের দশ কাঠা জমি ওদের জমি। ঐ জমি স্কুলকে দিয়ে সে এই চাকরিটা নিয়েছিল। সেদিক বিবেচনা করেও আবার তাকে স্কুলে ফিরিয়ে আনা হলো। মানে, চাস দেয়া হলো একটা। সংশোধন হওয়ার চাস।

রেজা সাহেব ক্লীষ্ট হাসি হেসে বললেন— চাস দেয়া হয়েছে? হুঁ। “ব্ল্যাক শ্যাল টেক নো আদার হিউ।”

কি বললেন?

: না, আর কিছু বলতে চাইনে। সিদ্ধান্ত যা নেয়ার তা তো নেয়া হয়েই গেছে।

হ্যাঁ সেই আর কি? আলিফ মিয়া জাহান্নামে যাক। আমার কথা, কৃষ্ণা আবার কাউকে জাহান্নামে টানে কিনা, সেইটেই এখন বিষয়ভাবে লক্ষণীয়।

: কথাটা বুঝলাম না।

না বুঝতে চাইলে তাকে বোঝায় কে?

জি?

www.boighar.com

: ওসব কথা রাখুন। আর একটা কথার ঠিক ঠিক জবাব দিন তো? ইদানীং নাকি প্রায় প্রতি রাতেই গভীর রাত পর্যন্ত আলো জ্বলে আপনার ঘরে। আমাদের গরীবুল্লাহ জানালার ফাঁকে উঁকি মেরে দেখছে আপনি লেখাপড়া করছেন। কিসের এত লেখাপড়া? প্রাইভেটে এম এ পরীক্ষা দেবেন নাকি?

আরে না-না, ও শখ আমার নেই।

তাহলে? তাহলে কি মিথ্যা দেখেছে গরীবুল্লাহ? সে যখন দেখেছে তখন জেগেই ছিলেন আপনি লিখছিলেন। পরীক্ষা না দিলে এত লেখাপড়া কিসের? কী লিখছিলেন অত রাতে?

: তাহলে হয়তো চিঠি লিখতে দেখেছে। মাঝে মাঝেই আমার বিভিন্ন বন্ধুদের চিঠি লিখি অনেক রাত পর্যন্ত—তাই হয়তো দেখেছে। এই দূর এলাকায় আমি কেমন আছি। তারা সবাই তা জানতে চায় তো?

জবাবে পুরোপুরি তৃপ্ত হতে না পেরে রেজা সাহেবকে বিদ্রূপ করার শখ জাগলো নূরীর। ফের সে প্রশ্ন করলো— শুধু বন্ধুরাই জানতে চায় তা, বান্ধবীরা চায় না?

: বান্ধবীরা!

: সত্যিই কোন বান্ধবী নেই আপনার?

মনে মনে বিব্রত হয়ে ওঠে রেজা সাহেবও ঠেশ দিয়ে বললো— আছে, একুজন আছে।

নূরী ভীষণ আগ্রহী হয়ে উঠে প্রশ্ন করলো— আছে? কে সে? মানে, কে তিনি?

রেজা সাহেব নির্বিকারকণ্ঠে বললো- আপনি।

চমকে উঠে নূরী বললো- আমি! আমি আপনার বান্ধবী নাকি? মৌজাক করছেন?

: তা যদি না হন, তাহলে আর কোন বান্ধবী নেই আমার। আপনারও কৌতূহল নিরর্থক।

তার অর্থ?

এর কোন অর্থ নেই।

নূসরত জাহান নূরী ঈষৎ ক্ষিপ্তকণ্ঠে বললো- বটে! চলে আয় সোহাগী, লোকটাকে যতটা সহজ মনে হয় ততটা সহজ নয়। ভেতরে প্যাঁচ আছে খানিক।

সোহাগীকে ডেকে নিয়ে বেরিয়ে গেল নূরী। নূরীকে শুনিয়া রেজা সাহেব সহাস্যে বললেন- এ রাগটাও কিন্তু নিরর্থক। এর কোন অর্থ নেই।



কৃষ্ণার কথামতো ঠিক দুইদিন পরেই আবার মাধব মোহন্তের বাড়িতে এলেন রেজা সাহেব। খবর পেয়েই হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলো কৃষ্ণা। বললো- এই যে আপনি আছি গেইচেন? ঠিক কাম হই গেছে বটে। আপনি আছিবেন, ই ধারণা মজবুত ছিল আমার তাই আছিল মানুষকে আজই ছৎবাদ দিয়াছি আমি। আপনি বহু, জরুর ছে লোক আছি যাইবে। আপনি বহু—

রেজা সাহেব বৈঠকখানায় বসে বললেন- আসল মানুষ কেমন?

তার পাশে এসে বসতে বসতে কৃষ্ণা বললো- আছিল মানুষ মানে কাজের মানুষ। যে মানুষ আপনাকে ঠিক ঠিক জায়গায় লই যাইতে আর ছব বাত্ ঠিক ঠিক সমঝাই দিতে পারবে, ছেই মানুষ। একদম এক্সপার্ট লোক।

রেজা সাহেব ফের প্রশ্ন করলেন- তাই? নামটা কি তার?

একটু ইতস্তত করে কৃষ্ণা অপেক্ষাকৃত নিচু গলায় বললো- উহার নাম বনোয়ারী। বনোয়ারী চাঁদ দাস। উও ভি এলেমদার আদমী। ক্লাছ টেন তক্ পড়াছুনা করিয়াছে বটে।

রেজা সাহেব খুশি হয়ে বললেন- আচ্ছা! বাড়িটা কি এই গাঁয়েই?

জি ছার, এই গাঁয়েই। উহার বাপদাদারা একদিন তামাম গাঁয়ের মাতবর ছিল বটে। জোতভুঁই ছিল জিয়াদা। আখুন আর তা নাই। ছব ছ্যাছ। ই লোকের দোছ নাই। আগেই ছ্যাছ।

বলো কি? এ লোকের সাথে এতদিনও দেখা হলো না আমার?

কৃষ্ণা স্নানকণ্ঠে বললো- কি করে হবে ছার। উ বনোয়ারী তো আমাদের ই-পাড়াতে বেছি আছে না। আমাদের মকানে তো বহুতদিন আর আছিলেক নাই।

আসেনি! কেন?

ছে, অনেক কতা ছার। আমার বাপ উহারে পছন্দ করে না, তাই।

সেকি! তাহলে আজ আসবে?

আছিবে ছার। আমার বাপ আজ মকানে নাই। ছে কতা উকে জানাই
দিয়াছি বটে। সে জরুর আছিবে।

একটু থেমে রেজা সাহেব আবার প্রশ্ন করলেন— তোমার বাপ ঐ বনোয়ারী
দাসকে পছন্দ করে না কেন? তুমি বলছো, বনোয়ারী এলেমদার। এলেমদার
মানুষ তো তোমার বাপের বেজায় পছন্দ।

ইঁ ছার, পছন্দ বটে। আমার বাপ আগে উহারে জিয়াদা পছন্দ করিত।
আখুন আর করে না।

: করে না কেন?

ছেটা আমাদের ঘরের বাত্ আছে ছার। উ বাত্ থাক।

ও আছা। তা ওটা না হয় থাকলো। এবার আর একটা কথা বলো দেখি!
তোমার বাপ সেদিন বললেন— তোমার শাদির ব্যাপারটা সব ঠিকঠাক হয়ে
আছে। কোথায় ঠিকঠাক হয়ে আছে? কোথায় শাদি হবে তোমার?

কৃষ্ণার কালো মুখ আরো কালো হয়ে গেল। সে ক্ষুদ্রকণ্ঠে বললো— কোথায়
আবার। আমাদের গাঁয়েই ছার। গাঁয়ের মধ্যপাড়ায় ঐ আদমীটার মকান। নাম
উহার মুরারী মোহন্ত।

মুরারী মোহন্ত।

ইঁ ছার। ঘাটের মড়া আর কি।

কী ব্যাপার! তুমি এমন করে কথা বলছো কেন? এ শাদি কি পছন্দ নয়
তোমার?

কী করে হইবেক ছার? আছির কাছাকাছি আদমীটার বয়ছ। ঝালুম বুঢ়া।
উহারে ছাদি করিতে কাহার খায়েশ হইবে, বাতাইয়ে?

সেকি! ঐ রকম একটা বৃদ্ধের সাথে শাদি দেবে তোমাকে? তোমার বাপের
এমন ইচ্ছা হলো কেন?

বাপ কয়, স্কুলে আলেফ মিয়ার ঐ ঘটনায় আমার বদনামী হই গেছে। কুয়ী
বড়লোক, বুনিয়াদি লোক আর ছুয়ানী লোক আমারে ছাদি করবেক নাই। উহারা
ছবাই লারাজ হই গেছে। উও মুরারী মোহন্ত বড়লোকও আছে। আমাকে ছাদি
করতে রাজি আছে। তাই বাপ আমার এই ছাদিই দেবে। একদম ঠিক ঠাক।
কোন নড়নচড়ন নাই।

তাজ্জব! তা স্কুলের ঐ ঘটনার জন্যে কেউ তোমাকে শাদি করতে চাচ্ছে
না। —এ কথা কি সত্যি? কেউ শাদি করতে চাচ্ছে না?

চাচ্ছে ছার, চাচ্ছে। বাপ বুটা বাত বলাছে বটে। বাপের উ কথা ঠিক নয়। ঠিক নয়? তাহলে উনি মিথ্যা বলছেন কেন?

উত্তেজিত হয়ে উঠে কৃষ্ণা বলল— ঐ মুরারী মোহন্তের ছম্পত্তির উপর আমার বাপের লজর পড়েছে যে! পুনচাছ-ছাট বিঘা জমিন আছে উ বুঢ়ার। উহার তিন কুলে কেছ নাই। বিমারী মানুছ। যখন তখন মরিয়া যাইবে। মুরারী বুঢ়া মরি গেলে উহার ছব ছম্পত্তি আমার বাপের হইবে, ব্যাস্!

সেকি! তোমার সুখ দুঃখের চেয়ে ঐ সম্পত্তিই তোমার বাপের কাছে বড় হলো?

তাহাই হইলো ছার। আমার বাপ ইখানে একদম অনুড়। আর ছব ব্যাপারে আমার বাপ বহুত ভাল মানুছ। কিন্তুক ছম্পত্তির লোভ উহার জব্বোর লোভ। ইখানে আমার বাপ আর ভাল মানুছ থাকে না। অমানুছ হই যায়।

তাহলে তুমি এখন কি করবে? ঐ বুড়োকেই শাদি করবে?

জান গেলেও নয়। কখখুনো নয়।

তাহলে?

: ছাদির দিন হয় আমি গলায় দড়ি দিবো, নয় বনোয়ারীর ছাথে দেছ ছাড়া হই যাবো—ব্যাস্। আর তিছুরা কুয়ী বাত্ নাই।

বিদ্যুৎ বেগে মাথা তুলে রেজা সাহেব বললেন— কী বললে? বনোয়ারীর সাথে? কোন বনোয়ারী? যাকে তুমি ডেকে পাঠিয়েছো, সেই বনোয়ারী?

ঝাঁকের মাথায় কথাটা বলে ফেলে কৃষ্ণা জড়োসড়ো হয়ে গেল। নুয়ে পড়লো লজ্জায়। কৃষ্ণাকে নীরব দেখে রেজা সাহেব ফের তাকিদ দিয়ে বললেন— কী হলো? আমার কথার জবাব দাও।

আস্তে আস্তে মাথা তুলে কৃষ্ণা মৃদুকণ্ঠে বললো— হঁ ছার, ঐ বনোয়ারীই বটে।

সেকি! তুমি যেতে চাইলেই বনোয়ারী তোমার সাথে দেশ ছাড়া হবে?

জরুর হবে ছার। বনোয়ারী তো একপায়ে খাড়া।

বলো কি! সে তোমাকে ভালবাসে?

বাছে। জিয়াদা ভালবাছে।

তুমি তাকে ভালবাসো?

বাছি ছার। ছোটকাল থাকিই আমরা দুইজন দুইজনকে জব্বোর ভালবাসি। বহুত পেয়ার করি।

কী তাজ্জব। এরপরও তোমার বাপ তোমার শাদি এ মুরারী মোহন্তের সাথেই দেবেন?

দেবে বটে। ঐ বুঢ়ার যে বহুত জমিন আছে।

জমিন আছে? তাহলে বনোয়ারীর কি কোন জোতভুঁই নেই? সে একজন কাঙাল লোক।

কাঙাল হউক আর বড়লোক হউক, বনোয়ারী বুঢ়াও নয়, বিমারীও নয়।
ছে আখুন মরিবে না আর আমার বাপ উহার জোতভুই পাইবে না।

আচ্ছা। তা বনোয়ারীর কতখানি জোতভুই আছে।

বেছি নাই! মুরারীর চেয়ে অনেক কম। পঁচিছ-তিরিছ বিঘা হবে ছব
ছমত।

তাহলেও বা কম কি? তাতে তো একটা সংসার অনায়াসেই চলে যাওয়ার
কথা।

যায় ছার, ছহজেই চলে যায়। পুনোরা-বিছ বিঘা হইলেই একটা বড়
ছংছার খোছহালে চলে যায়। ইখানকার জমিন বহুত আবাদি জমিন বটে।

তবে?

ঐ বনোয়ারী মোটেই ছংছারী লয় যে। ছে ছংছার দেখে না গান গেয়ে
বেড়ায়। বাপ-মা কেছ নাই। উহার জমিন অন্য মানুছে খায়। বনোয়ারী গান
গায়। নাটক করে, কবি গানের পয়ার লেখে নদীর ধারে বছে বছে। আমার বাপ
উহারে “বাউরে” বলে। বাউরের ছাথে বাপ আমার ছাদি দিতে বিলকুল নারাজ।

সেকি! উনি বাউরে বলছেন কাকে? আমার তো মনে হছে বনোয়ারী বড়
মাপের মানুষ। একজন গুণীলোক।

উদ্বেলিত হয়ে উঠে কৃষ্ণা বললো— গুণী ছার, জব্বোর গুণী। আমার বাপ
ছাড়া ছবাই তাই কয়। কি মিঠা উহার গানের গুলা। নাটকে পাঠ বলে গড়গড়
করে। মাথায় মুকুট দিয়ে চকচকে পোছাকে ছে যখন কৃছনো ছাজে ছার, তখন
উহার দিকে লজর না দিয়া পারে এমুন ছাদি কার? বিলকুল রাজপুত্রর বনি যায়।
তা দেখি যুবত মাইয়ারা আওয়ারা বনি যায় বিলকুল।

খুশিতে কৃষ্ণার চোখ-মুখ চকচক করতে লাগলো। রেজা সাহেব বললেন—
আচ্ছা।

কৃষ্ণা বললো— কবিয়াল হিছাবেও নাম আছে তার। ছবাই বলে, বনোয়ারী
একদিন মস্ত বড় কবিয়াল বনি যাইবে জরুর।

বলো কী? এমন একজন গুণী লোককে পছন্দ করলেন না তোমার বাপ।

: করলেক নাই বটে। আগে উহারে পছন্দ করিত জিয়াদা। কিন্তু মুরারীর
জমিন আখুন আমার বাপের মাথা বিগুড়াই দিল বটে।

না-না, এটা হতে পারে না। মেয়েকে ভাসিয়ে দিয়ে জমিন? উনার তো
শুনেছি অনেক জমিন আছে। আরো জমিন নিয়ে করবেন কী তোমার বাপ?

কৃষ্ণা এবার অনুনয় করে বললো— আপনি সমঝাই দিন ছার। আমার বাপেরে
আপনি ছে কতা সমঝাই দিন। বাপ আপনারে দেউতার মতো মানিয় করে।
আপনি বোঝাই বললে আমার বাপ আপনার কতা মানিয়া লইবেক ঠিক-ঠিক।

তা আমার কথা কি আসলেই উনি মানবেন?

মানিয়া লিবে ছার। আমার মুন বুলছে— মানিয়া লিবে। একবার কোছেছ করিয়া তো দেখুন।

আচ্ছা-আচ্ছা। আজ তো উনি বাড়িতে নাই। আর একদিন এসে তাহলে কোশেশ করে দেখবো।

সাচ্ ছার?

সাচ।

ওয়াদা?

ওয়াদা।

এই সময় সেখানে এসে হাজির হলো বনোয়ারী। তাকে দেখে রেজা সাহেব অভিভূত হলেন। মনে মনে কৃষ্ণার পছন্দের তারিফ না করে পারলেন না। গায়ের রঙ কালো হলেও, বনোয়ারী সত্যিই একজন দর্শনধারী যুবক। সুঠাম গঠন, পরিপাটি মুখমণ্ডল, ঝাঁকড়া চুল, স্ফীত বক্ষ, উন্নত ললাট। রেজা সাহেব বুঝলেন। শুধু নাটকেরই নয়। বাস্তবে সে একজন যোগ্য নায়ক।

বেলা চলে যাচ্ছিল। পয়পরিচয় সেরে নিয়ে রেজা সাহেব তখনই বেরিয়ে পড়লেন বনোয়ারীর সাথে। গাঁয়ের অনেক অংশ ঘুরে ঘুরে দেখলেন আর তৃপ্ত হলেন বনোয়ারীর কাজে ও আচরণে। অবশেষে বিদায় নিয়ে রেজা সাহেব যখন নুরীদের বাড়িতে এসে পৌঁছালেন, তখন ঐ একই কাহিনী। সন্ধ্যাকাল অনেক আগেই অতীত হয়ে গেছে।

গ্রামটা দেখার গরজ তেমন আর না থাকলেও, কৃষ্ণার অনুরোধ রক্ষা করার গরজে রেজা সাহেবকে আবার পরপর কয়েকদিন আসতেই হলো কৃষ্ণাদের বাড়িতে। চেষ্টা করতে হলো তাঁকে অনেক। একটানা কয়েকদিন সমঝানোর পর নেশা কাটলো কৃষ্ণার বাপ মাধব মোহন্তের। রেজা সাহেবের অকাট্য যুক্তি ও হৃদয়গ্রাহী আবেদনে সাড়া দিলো মাধব মোহন্ত। অবশেষে তিনি কৃষ্ণার শাদি বনোয়ারীর সাথে দেয়ারই জোর ওয়াদা করলেন। সেই সাথে প্রতিজ্ঞা করে বললেন, ঐ জ্যান্ত-মরা মুরারীর তিনি মুখদর্শনই করবেন না আর কখখনো, তার সাথে মেয়ের শাদি দেয়া তো দূরের কথা। মাটি স্পর্শ করে কিরা কাটলেন তিন তিন বার।

কৃষ্ণার অনুরোধ রক্ষার দায়টাও মিটলো। তবু এরপরও রেজা সাহেব আরো কিছুদিন এই এলাকাতেই ঘুরে বেড়ালেন বনোয়ারীর নাছোড়পিণ্ডে আমন্ত্রণে। বনোয়ারীর সাথে এই গাঁয়ের ও পাশের কয়েকটি গাঁয়ের সাঁওতালপাড়ায় ঘুরলেন আর তাদের কয়েকটি পরব অনুষ্ঠানও দেখে বেড়ালেন সাগ্রহে। অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্যে দূর থেকে অবলোকন করে গেলেন সাঁওতালদের হাঁড়িয়া খাওয়ার মহোৎসব আর তাদের বেধড়ক মাতামাতি ও মাতলামি।

অভিজ্ঞতা অর্জন সম্পন্ন করে রেজা সাহেব যখন সাঁওতালপাড়া পুরোপুরি ছাড়লেন তখন অন্যদিকে অনেকে তাঁকে ছাড়ি ছাড়ি অবস্থা। বলাবাহুল্য নুরীদের বাড়িতে ইতোমধ্যেই তিনি এক বর্জনীয় বস্তুতে পরিণত হতে চলেছেন। দীর্ঘদিন

তঁার সাঁওতাল পাড়ায় পড়ে থাকার দরুন, ঝড় উঠেছে সমালোচনার, তুফান ছুটেছে বদনামের।

আবার চা-নাশতা ফেরত আনতে দেখে নূসরত জাহান নূরী সোহাগীকে প্রশ্ন করলো— কি হলো সোহাগী? ওগুলো ফেরত নিয়ে এলে যে?

জবাবে সোহাগী বললো— কি করবো? মাগরিবের নামাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও আরো আধঘণ্টা সময় অপেক্ষা করলাম। চা তো পানি হয়ে গেলই, নাশতার দফাও রফা হওয়ার পথে। আর কতক্ষণ অপেক্ষা করবো?

সবিস্ময়ে চেয়ে থেকে নূরী বললো— তার অর্থ? পণ্ডিত সাহেব কি ফিরে আসেননি স্কুল থেকে?

www.boighar.com

না গতকাল ঠিক সময়ে এসেছিলেন বটে। কিন্তু গত পরশুও এই একই অবস্থা গেছে। মাগরিব পেরিয়ে এশা ধর-ধর, তবু পণ্ডিত সাহেবের ফেরার নাম ছিল না।

সেকি আবার কোথায় তাহলে যাতায়াত করতে লাগলেন?

মুখ গোমড়া করে সোহাগী বললো— কোথায় আবার যেখানে তঁার অভ্যাস, সেখানেই যাওয়া ধরেছেন আবার হয়তো।

নূরী বাধা দিয়ে বললো— না না, তা আর যেতে পারেন না। যে ধোলাই দিয়েছি সেদিন, শরম-আক্কেল থাকলে আর ঐ গাঁয়ে পা বাড়াবেন না উনি।

হাসির একটা ক্ষীণরেখা নূরীর ঠোঁটে ঝিলিক দিয়ে গেল। মুখ টিপে হেসে সোহাগী বললো— ঐ গাঁয়ে না হোক, ঐ বাড়িতেই তো যেতে পারেন?

ঐ বাড়িতে! কোথায়? কৃষ্ণাদের বাড়িতে?

জি-আপা, ওখানেই।

: কি যে বলিস? তাই কি আর যান? হাজার হোক, উনি একজন রুচিশীল শিক্ষিত মানুষ। বড় শহরের লোক। ঝাঁকের মাথায় আগে কয়েকবার গেছেন ঠিকই। কিন্তু এ নিয়ে পাঁচজন পাঁচ কথা বলাবলি করছে এখন। এরপরও কি আর উনি যেতে পারেন সেখানে? ঐ নোংরা সাঁওতাল বুনোদের বাড়িতে? পারেন না।

: পারেন আপা, পারেন। ঐ যে লোকে বলে— “রূপেতে মজিল মন, কিবা হাঁড়ি, কিবা ডোম”। স্কুল ছুটির পরে আপনার মামুজান নিজেই পণ্ডিত সাহেবকে ঐ দিকে যেতে দেখেছেন গতপরশু। তঁার মুখেই একথা আমি শুনেছি।

: আমার মামুজানের মুখে?

হ্যাঁ আপা, আমার মনে হয় আজও ওখানেই গেছেন।

বলিস কি! আবার উনি ঐ পথে পথ ধরেছেন? চলতো, মামুজানকে জিজ্ঞাসা করে দেখি তো?

সোহাগীকে সাথে নিয়ে বৈঠকখানার দিকে আসতেই সামনে পড়লো বাড়ির বিশ্বাসী আর বয়সী চাকর গরীবুল্লাহ। সাঁঝওয়াক্ত অনেক আগেই পার হয়ে

গেছে। রীতিমতো আঁধার জমে গিয়েছে বাইরের বাড়িতে। তাদের ব্যস্তপদে সেদিকে আসতে দেখে গরীবুল্লাহ প্রশ্ন করলো— কি হলো মামণি, এই আঁধারের মধ্যে কোথায় যান।

নূরী বললো— মামুজানের কাছে। মামুজান বৈঠকখানায় আছেন কি?

গরীবুল্লাহ বললো— না, ওখানে কেউই নেই এখন। কেন মা?

মানে ঐ পণ্ডিত। ঐ পণ্ডিত সাহেব আজও আর এখনো স্কুল থেকে আসেননি।

আসেননি? এখনও আসেননি? সেকি?

কোথায় যে আজ আবার গেলেন—

কেন? উনি তো ঐ সাঁওতাল পাড়ায় মাধব মোহন্তের বাড়িতে গেছেন।

চমকে উঠলো নূরী। বললো— মাধব মোহন্তের বাড়িতে? তুমি জানলে কেমন করে?

কি করে আবার! আমি যে নিজের চোখে দেখে এলাম। সূর্য ডোবার অনেকখানি আগে দেখে এলাম, মাধব সাঁওতালের মেয়ে কৃষ্ণার সাথে পণ্ডিত সাহেব গল্প করছেন বসে বসে।

নূরীর কর্ণমূল লাল হয়ে উঠলো। বললো— গল্প করছে? কোথায়?

ওদের ঐ বৈঠকখানায়। একদম মুখোমুখি বসে আছে দেখে এলাম। গল্প করছে আর খুব হাসাহাসি করছে।

হাসাহাসি করছে? ওখানে কি আর কেউ ছিল?

: ঠিক বলতে পারবো না। একটু দূর থেকে দেখা তো! তবে মনে হলো কেউ নেই। অন্তত ওদের নিকটে কেউ ছিল না।

: তুমি ঠিক দেখেছো? কৃষ্ণার সাথে বসে যে গল্প করছে, সে আমাদের এই পণ্ডিত— এটা তুমি ঠিক দেখেছো তো। মানে এ ব্যাপারে তোমার মনে কোন সন্দেহ নেই তো।

আরে বলে কি? সন্দেহ থাকবে কেন? দিনের বেলা দেখা। আকাশে সূর্য দপ দপ করছে তখনও। ওদের বাইরের আঙ্গিনার একদম কোল ঘেঁষে রাস্তা। পুরো এক বিঘা দূরেও হবে না। আমি সেখান থেকে দেখলাম। দেখতে ভুল করবো কেন? আরো একদেড় বিঘে দূরে থেকে দেখলেও চিনতে ভুল আমার হতো না। এছাড়া পণ্ডিত সাহেবের কণ্ঠস্বরও আমার মুখস্থ।

বলো কি! তা তুমি ওখানে কী করতে গিয়েছিলে?

আমাদের ঐ লাল বলদকে খুঁজতে। আজও বলদটা দুপুর থেকে নেই। খুঁজতে খুঁজতে ওখানেই গেলাম। আরো দুইদিন বলদটা ঐ সাঁওতাল পাড়াতেই গিয়েছিল তো! আজও দেখি হ্যাঁ, গাঁয়ের ঐ পশ্চিম মাথায় হরি সাঁওতালের পাগাড়ে ধুমছে ঘাস কামড়াচ্ছে বদমায়েশ বলদটা।

নূরীর কণ্ঠ রোধ হয়ে গেল। আর কোন কথা তার মুখ থেকে বেরলো না। কিছুক্ষণ কাঁঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ওখানেই। এরপর অন্দরের দিকে পা বাড়াতেই হন হন করে চলে এলেন রেজা সাহেব। ঘরে ঢোকান পথে নূরীরা সামনে পড়ায় তাদের গুনিয়ে ঈষৎ হেসে বললেন— সরি, আজও একটু রাত হয়ে গেল।

রেজা সাহেবের শংকা ছিল, আজ তিনি অবশ্যই শক্ত তিরস্কার শুনবেন নূরীর। কিন্তু তিরস্কার করা তো দূরের কথা, তাঁর কথার প্রেক্ষিতেও কোন কথা বললো না নূরী। নীরবে সে অন্দরে চলে গেল। অন্দরে যাওয়ার পথে সোহাগী জিজ্ঞাসা করলো— আবার কি উনার চা-নাশতা নিয়ে যাবো আপা?

নূরী কঠিনকণ্ঠে বললো— না।

সোহাগী বললো— কিন্তু নাশতাপানি কোথাও যদি না খেয়ে থাকেন? সেই সকাল দশটার দিকে খেয়ে গেছেন, এখন রাত প্রায় আটটা। উনি তো ক্ষুধায় মারা যাবেন!

নূরী একইকণ্ঠে বললো— মরুক!

এর বেশি কোন কথাই নূরী তখন বললো না।

কিন্তু নূরীকে বলতেই হলো। কৃষ্ণাদের বাড়িতে রেজা সাহেবের যাতায়াত আর কৃষ্ণার সাথে তাঁর ওঠাবসা অব্যাহত থাকায় এবং তা ক্রমেই ছোট-বড়, শূদ্র-ভদ্র অনেকের দৃষ্টিগোচর হওয়ায়, এ নিয়ে এলাকাতে শুরু হলো গুঞ্জরণ। সে গুঞ্জরণের ছোট-বড় ধাক্কা নূরীর কানে এসে পড়তে লাগলো মাঝে মাঝেই। অসহ্য হয়ে ওঠায় নূরী একদিন সক্রোধে ছুটে এলো রেজা সাহেবের ঘরে। এসেই তাঁকে আক্রমণ করে বললো— এসব হচ্ছে কি? এটা কি করছেন আপনি?

কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে রেজা সাহেব শান্তকণ্ঠে বললেন— কি করছি?

নূরী বললো— জাতটা না দিয়ে আর ছাড়লেনই না শেষ পর্যন্ত?

জাত দিলাম! জাত দিলাম কোথায়?

হাঁড়ি-ডোম-সাঁতালের ঘরে, আবার কোথায়? ঐ একটা বুনো মেয়েকেই এত মনে ধরলো আপনার?

বুনো মেয়েকে মনে ধরলো! কার কথা বলছেন, কৃষ্ণার কথা?

তবে কি আমার কথা বলছি?

বলতে দোষ কী?

মানে?

আপনাকেও তো মনে ধরতে পারে আমার। মন বলে একটা পদার্থ যখন আমার মধ্যে আছেই, তখন যে কোন জনকেই তো আমার মনে ধরতে পারে।

না, পারে না। আমাকে মনে ধরার মতো কোন স্পর্ধা হতে পারে না আপনার। এর কোন কারণও থাকতে পারে না।

পারেই তো। সেই শুরু থেকে যে ব্যক্তি আমাকে নিয়ে এতটা তৎপর, আমার অসুখ-বিসুখ, নাওয়া-খাওয়া, ঘরে ফেরা-না-ফেরা প্রভৃতি প্রতিটি বিষয় নিয়ে যিনি এতটা ব্যস্ত, এতটা উদগ্রীব ও উৎকর্ষ— এক কথায়, আমার প্রতি যাঁর এতটা দরদ, তাকে মনে ধরবে না, আমার মনটা কি এতটাই পাষাণ?

নূরী ফুঁসে উঠলো সাপের মতো। বললো— খবরদার! ফালতু কথা খবরদার বলবেন না।

রেজা সাহেব নির্বিকার কণ্ঠে বললেন— ফালতু কথা বললাম?

আলবৎ ফালতু কথা। ফালতু কথা বলে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করছেন। এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন কৃষ্ণার কথা।

কৃষ্ণার কথা—কী কথা?

বারবার তার কাছে যান কেন আপনি?

সে ডাকে, তাই যাই।

ডাকলেই যেতে হবে? তাও আবার ঐ কৃষ্ণার ডাকে?

তবু তো কৃষ্ণা আমাকে ডাকে। অন্য কেউ তো ভুলেও ডাকে না আমাকে যে, তার কাছে যাবো?

ডাকলেই আপনি যাবেন?

ডেকে একবার দেখুনই না আমি যাই কি না?

নূরী আবার গর্জে উঠে বললো— ফের! আপনাকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি— স্পর্ধার সীমা লঙ্ঘন করবেন না।

এই তো আবার ঠেকিয়ে দিলেন। এর সীমাটা কোথায়, তাইতো বুঝতে পারছিলেন আমি।

: কী রকম? কি বলতে চান আপনি?

: বলছি, এ বাড়িতে এতদিন ধরে আছি। মৃধা সাহেব, চৌধুরী সাহেব বা অন্য কারোরই আমার ওপর এমন প্রগাঢ় দৃষ্টি নেই। তাঁদের বাড়িতে আছি— এটাই তাঁরা জানেন। এই স্কুলের একজন শিক্ষক আমি— সেই হিসেবেই তাঁরা মানেন। আমার ওপর খবরদারি করার স্বতঃস্ফূর্ত অধিকার কেউ তাঁরা অর্জন করতে পারেননি। এ অধিকার তাদের কারো নেই। একমাত্র আপনারই তা আছে। এ অধিকার জোর করে পাওয়া যায় না। অর্জন করতে হয়। আপনি তা অর্জন করেছেন নিঃসন্দেহে আর নিরঙ্কুশভাবে।

নূরী অসহিষ্ণু হয়ে উঠতেই রেজা সাহেব হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন— আমি এতে খুশি আর তাই প্রতিবাদ করিনে। বরং আপনি ঐ

খবরদারিটুকু না করলেই আমার খারাপ লাগে। এই বিদেশে বিড়ুইয়ে নিজেকে বড় অসহায় মনে হয়। সবকিছুরই অবলম্বন চাই একটা। আপনি এখানে আমার সেই অবলম্বন। আপনার কাছে মন খুলে দুটো সত্যি কথা বলাটাকে স্পর্ধার সীমালঙ্ঘন ভাবি কী করে?

থামুন আমি আপনার ছাত্রী নই। আপনার কাছে কোন কিছুর এক্সপ্লানেশান শুনতে চাইনি আমি। গুরুগম্ভীর লেকচার দিয়ে পঞ্জিতি জাহির করতে হবে না আমার কাছে। আমি যা জানতে চাই, তারই ঠিক জবাবটা দিন।

আপনি খামাখা রাগ করছেন। জবাবটা তো আমি ঠিক ঠিকই দিচ্ছি।

ঠিক ঠিকই দিচ্ছেন? তাহলে ঠিক ঠিক বলুন তো দেখি— কৃষ্ণার কাছে বারবার যান কেন আপনি?

www.boighar.com

ঐ যে বললাম, কৃষ্ণা আমাকে ডাকে, তাই যাই।

সেই ডাকেটা কেন?

আমাকে যে তার ভীষণ দরকার। আমি তার ডাকে সাড়া না দিলে দুঃখে ক্ষোভে গলায় সে দড়ি দিতেও পারে। অর্থাৎ এমনই এক নিদারুণ সমস্যায় পড়ে আছে সে।

: কী সে সমস্যা?

ওটা হৃদয়ঘটিত ব্যাপার, মানে বিবাহঘটিত সমস্যা।

বটে! তাহলে তার সেই সমস্যার সমাধানে একমাত্র আপনাকেই বেছে নিয়েছে সে, না কি বলেন?

জি-জি। যার দ্বারা যে কাজটা সম্ভব, তাকেই তো বেছে নেয় মানুষ।

: অর্থাৎ?

আমি ছাড়া আর দ্বিতীয় কেউ তার এ সমস্যা থেকে তাকে উদ্ধার করতে পারবে না।

আপনিই তার একমাত্র উদ্ধারকর্তা তাহলে?

জি, তা ভাবতে পারেন।

নিদারুণ আক্ষেপের সাথে নূরী বললো— তাজ্জব! ঐ কৃষ্ণার মধ্যে আপনি এমন কি দেখেছেন যে, ঐ কৃষ্ণাই এখন আপনার ধ্যান আর জ্ঞান?

মানে?

এত সুন্দরী মেয়ে কি আপনি আর কোথাও দেখেন নি? আপনাদের ঐ ঢাকা শহরেও না?

দেখবো না কেন? ভুরি ভুরি দেখেছি। এর চেয়ে দশগুণে অধিক সুন্দরী মেয়ে যত্রতত্র আছে। ঢাকা শহরে খোঁজার প্রয়োজনই পড়ে না।

তাহলে ওকে আপনার হঠাৎ ভাল লাগলো কেন?

ভাল লাগার কি কোন সংজ্ঞা আছে? এটা অনুভূতির অর্থাৎ চোখে লাগার ব্যাপার। নিশ্চয়ই বোধ হয় ঐ কথাটা শুনেছেন, “এ দুনিয়ায় সুন্দর কে, যার চোখে লাগে যে”। এটা হলো সেই ব্যাপার। আমার চোখে কৃষ্ণাকে বেশ সুন্দরী বলেই মনে হয়েছে আর তাই সে দৃষ্টি কেড়েছে আমার।

মনও কেড়েছে সেই সাথে, সেটা বলছেন না কেন?

সেটা অন্য ব্যাপার। তবে দৃষ্টি কেড়েছে, এটা নির্ঘাত।

নূরী অত্যন্ত ঘৃণার সাথে বললো— ছিঃ! আপনাকে যে মরণ রোগে ধরেছে— এটাও নির্ঘাত।

জি?

: বহিঃমুগ্ধ পতঙ্গের চেয়েও অধিক অন্ধ হয়ে গেছেন আপনি। আপনার সাথে কথা বলতেও এখন ঘৃণা হচ্ছে আমার। সাঁওতাল বুনোর দুর্গন্ধ আপনার গা থেকেও বেরিয়ে আসছে, মনে হচ্ছে।

চোখ মুখ বিকৃত করে ঘুরে দাঁড়ালো নূরী।

রেজা সাহেব ব্যস্তকণ্ঠে বললেন— আরে এই যে, শুনুন— শুনুন। যান কেন? আসল ব্যাপারটা পুরোপুরি না বুঝেই—

নূরী যেতে যেতে বললো— আর বেশি বোঝার রুচি নেই আমার। যেটুকু বুঝেছি, এতেই বমনের উদ্রেক হচ্ছে। থুঃ! আলেফ মিয়ার একার আর দোষ রইলো কি।

দ্রুতপদে অন্দরে প্রবেশ করলো নূরী। চুপচাপ বসে থেকে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন রেজা সাহেব।

একজন শিক্ষক না হলে হয়তো এতটা হতো না। একজনের সাঁতালপাড়ায় যাতায়াত নিয়ে এত কথা উঠতো না। ভিনদেশী না হলে ইতর-ভদ্র সবাই ভিড় করে এমন মুখরোচক আলোচনায় অংশ নিতেও সাহস পেতো না। এসব কারণেই এমনটি হলো। রেজা সাহেবকে নিয়ে সেই যে শুরু হলো সমালোচনা, অতঃপর দিন যতই যেতে লাগলো, ততই সেটা মুখে মুখে ফিরতে লাগলো।

করিম বকশো নাটিকাবাড়ি গ্রামের একজন অন্যতম মাতবর আর মুসল্লি কিসিমের লোক। নূরীর মামুজান আহাসান আলী মৃধা সাহেবকে সামনে পেয়ে খেদ করে বললেন— একি আপদ আপনি পথ থেকে কুড়িয়ে আনলেন মৃধা সাহেব? এটা কি আপনাদের মানায়? এটা হিন্দু, না বৌদ্ধ, না খ্রিস্টান?

রেজা সাহেবকে ঘিরে নানা রকম কথাবার্তা তাঁর কানেও ইদানীং বেশ ঘন ঘনই পড়ছে। ইনিও যে তাই বলতে চান, কথার ধরণ দেখেই তা বুঝতে পারলেন মৃধা সাহেব। তবু তিনি প্রশ্ন করলেন— কি বলছেন, তা তো ঠিক বুঝলাম না?

বকশো সাহেব বললেন— আপনারা হাজি-গাজি আপনাদের বাড়িতে কেউ

থাকলে সে লোক যে মোল্লা মুসল্লি হবে, এটাই সবাই একবাক্যে ধরে নেবে। কিন্তু এ কোন লোককে আশ্রয় দিয়েছেন আপনারা—যে লোক সারাবেলা সাঁওতালপাড়ায় গিয়ে পড়ে থাকে? মুখভর্তি আবার ঘন দাড়িও আছে মিশকালো। ইনি কি আসলেই মুসলমান, অমুসলমান ঋষি-সন্ন্যাসি কেউ? এর মধ্যে কি ইসলামী জজবা এক রত্তিও আছে?

আপনি কার কথা বলছেন? আমাদের ঐ থার্ডপণ্ডিত সাহেবের কথা কি?

হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঐ থার্ডপণ্ডিত মশাইয়ের কথাই বলছি। সাহেব বলছেন কাকে? ওকে মশাই বলুন, মশাই। কপালে ফোঁটা তিলকটা নেই, এই যা!

বকশো সাহেব!

: আরে নিছকই একজন হিন্দুপণ্ডিত হলে না হয় এতটা কান দিতাম না এদিকে। কিন্তু শিক্ষকতা করতে এসে একজন মুসলমান মানুষ একটা সাঁওতাল মেয়ের প্রেমে হাবুডুবু খাবে—এটা কি মেনে নেয়া যায়? তাড়ি-টারি, মানে ওদের ঐ হাঁড়িয়া খাওয়াও ধরেছে কি-না, কে জানে? একে কেন শিক্ষকতায় আনলেন আপনারা আর স্থান দিলেন নিজের বাড়িতে—এটা মাথায় আমার ধরছে না।

মৃধা সাহেব আমতা আমতা করে বললেন— দেখুন বাড়িতে তাকে স্থান দিয়েছি ঘটনাচক্রে।

জেনে-চিনে নয়। আর স্কুলে চাকরি দিয়েছেন, বলতে গেলে আমাদের জেলা শিক্ষা অফিসার। স্কুল কমিটি বা আমরা কেউ দেইনি।

তা দেননি, বেশ করেছেন। এখন ওকে তাড়ান। স্কুলের সুনামের আর আমাদের স্বজাতির মুখে অধিক কালি না মেখে ওকে শিল্পির বিদায় করুন এই এলাকা থেকে।

আর না দাঁড়িয়ে ফুঁসতে ফুঁসতে চলে গেলেন বকশো সাহেব। মৃধা সাহেব কিছুক্ষণ ওখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন বিভ্রান্তভাবে।

এসব কথা আপছে আপ্ তামাম প্রধান মাতবরদের কানে এসে পড়েনি। অনেকের বাড়ি ঘুরে ঘুরে এসব কথা পৌঁছে দেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে নাটেরগুরু স্কুলের ঐ স্বনামধন্য শিক্ষক আলোফ মিয়া। নিজের দোষ ধুয়ে ফেলার উদ্দেশ্যে সে সর্বত্রই ঢোল পিটিয়ে বেড়াচ্ছে।

নূরীর আব্বা ইসমাইল হোসেন চৌধুরী সাহেবকে হঠাৎ সেদিন সামনে পেয়ে আলোফ মিয়া রাস্তাতেই মনের ঝাল মিটিয়ে নিলো খানিক। কোন সালাম-কালাম না জানিয়েই আলোফ মিয়া সরাসরি বললো— এখন কেন চুপচাপ আছেন চৌধুরী সাহেব? এখন যে কিছুই বলছেন না?

আলোফ মিয়ার এই বেআদবীতে মনে মনে নাখোশ হলেন চৌধুরী সাহেব। প্রশ্ন করলেন— কিছুই বলছিলেন কি রকম? কিসের কিছুই বলছিলেন?

কিসের? দেবতা করলে লীলা, আর মানুষে করলে নষ্টামি, তাই নয়? এখন

যে মুখে একদম কুলুপ এঁটে বসে আছেন। সেদিন তো খই ফুটেছে মুখে আপনাদের। নরম কাঠে ছুতারের বল— না কি বলেন?

চৌধুরী সাহেব বিরক্ত হয়ে উঠলেন বললেন— আহ্ আলোফ উদ্দিন! কী বলতে চাও, সরাসরি বলো। এসব বাজে কথা বলছে কেন?

বাজে কথা? হ্যাঁ, বাজে কথা তো হবেই অপ্রিয় সত্য কথাগুলো সব সময় বাজে কথাই হয়।

কি তোমার সত্য কথা?

আপনাদের ঐ গুণধর থার্ডপণ্ডিতের কুকর্মের কথা। সত্য কথা আবার কি? তার কুকর্মের বিরুদ্ধে আজ কিছুই বলছেন না কেন আপনারা কেউ? সবাই আজ নীরব কেন? বিশেষ করে আপনারা?

থার্ডপণ্ডিতের কুকর্ম! কি করেছেন তিনি?

তাজ্জব! কি করেছেন, তা এখনও জানেন না নাকি? দীর্ঘদিন ধরে ঐ সাঁওতাল পাড়ায় যে দেবলীলা করে চলেছেন উনি, তা আজও কি নজরে বা কানে পড়েনি আপনার?

দেবলীলা কী রকম?

ব্যভিচার—ব্যভিচার, ঘোর নষ্টামি। মাধব সাঁওতালের মেয়ে ঐ কৃষ্ণার সাথে যে কেলেংকারীটা করে বেড়াচ্ছেন আপনাদের থার্ডপণ্ডিত, তা মুখে উচ্চারণ করতেও আমার ঘেন্না হয়। মাত্র একটা কথা বলার জন্যে কৃষ্ণার কাছে গিয়েছিলাম আমি, আর সেইটেই হলো আমার অপরাধ। এখন যে এই থার্ডপণ্ডিত কৃষ্ণার সাথে প্রতিদিন ধুমছে নষ্টামি করে বেড়াচ্ছে, এটা আর অপরাধ হচ্ছে না। দেবতার বেলা লীলা আর আমার বেলা ব্যভিচার। বাঃ! চমৎকার আপনাদের বিচার!

চৌধুরী সাহেব খতখম করে বললেন— এ্যা! এ তুমি কি বলছো? নষ্টামি করে বেড়াচ্ছে মানে?

নষ্টামির অর্থটা বুঝছেন না? একদম কেষ্টলীলা। চারদিকে ছিঃ, ছিঃ পড়ে গেছে।

চৌধুরী সাহেব বিস্মিতকণ্ঠে বললেন— তাজ্জব! ব্যাপারটা কী খুলে বলতো? ঐ কৃষ্ণাটা কি আবার স্কুলে আসা ধরেছে?

আজ্ঞে না। ঐ পণ্ডিত সাহেবই এখন দৈনিক ঐ সাঁওতালপাড়ায় যাওয়া ধরেছেন। সেখানে গিয়ে প্রতিদিন কৃষ্ণার সাথে চরম নষ্টামি করে বেড়াচ্ছেন।

আলোফ উদ্দিন!

: আমাকে বিশ্বাস না হয়, অন্যকে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারেন। আপনি না জানলেও এ কেলেংকারীর কথা কারোরই আর অজানা নেই।

চৌধুরী সাহেব হতভম্ব হয়ে গেলেন। বললেন— কি অসম্ভব কথা বলছে

তুমি? সত্যিই কি তোমার কথা ঠিক?

আলেফ মিয়া বললো— বললামই তো, অন্যদের জিজ্ঞাসা করে দেখুন। দুই একদিনের ব্যাপার তো নয়? দীর্ঘদিন ধরে এই পণ্ডিত সাহেব ঐ সাঁওতালপাড়ায় যাচ্ছেন আর সমানে কুকর্ম চালাচ্ছেন।

: কুকর্ম চালাচ্ছেন?

কুকর্ম বলে কুকর্ম? তাড়ি-মদ খাওয়া, সাঁওতালদের পরবে সাঁওতালদের সাথে নাচ-গান করা, মদ খেয়ে মাতলামি করা— এ সব তো আছেই, এর সাথে বড় কুকর্ম হলো, মাধব মোহন্তের বাড়িতে এসে প্রতিদিন কৃষ্ণার সাথে চরম নষ্টামি করা। কুকর্মের ফিরিস্তি আর কত চান?

মাধব মোহন্তের বাড়িতে? মাধব মোহন্ত আপত্তি করে না?

আরে আপনি তো দেখছি এখনও মায়ের গর্ভেই আছেন। মাধব মোহন্ত আপত্তি করবে কি? মাধব মোহন্ত তো হাতে স্বর্গ পেয়ে গেছে। হবু জামাইয়ের সাথে বিবাদ করে কেউ কখনো.....?

: হবু জামাই!

থার্ডপণ্ডিতের সাথে ঐ কৃষ্ণার বিয়ে হচ্ছে যে!

খামো! যতসব অবাস্তুর কথা। সাঁতলরা কী জাত দেয় সহজে? তাদের কি সমাজের ভয় নেই?

আহহা, সাঁওতালেরা জাত দেবে কেন? জাত দিচ্ছেন তো ঐ থার্ডপণ্ডিত নিজেই। নিজেই উনি সাঁওতাল হচ্ছেন। সব ঠিকঠাক।

চৌধুরী সাহেব আর সহ্য করতে পারলেন না। ধমক দিয়ে বললেন— খামোশ! তোমাকে আমি চিনি। তুমি সব বলতে পারো। শুকুনের নজর সবসময়ই ভাগাড়ের দিকে। তুমি সরো—

ক্রোধভরে তার সামনে থেকে সরে এলেন চৌধুরী সাহেব। কিন্তু সরে এসেও রেহাই তিনি পেলেন না। ঘটনাটা একটু খতিয়ে দেখতে গিয়েই আটকে গেলেন তিনি। দেখতে পেলেন, আলেফ মিয়ার বর্ণনার মতো এত কদর্য না হলেও, কিছুটা সত্যতা আছে এই ঘটনার মধ্যে। থার্ডপণ্ডিত সাহেব যে এখন মাঝে মাঝেই মাধব সাঁওতালের বাড়িতে যান, গল্প করেন কৃষ্ণার সাথে আর কোন কোন দিন যে ঘুরে বেড়ান সাঁওতালদের উৎসব অনুষ্ঠানে— এ খবর অনেকেই রাখে। জানতে পারলেন, অনেকেই তা নিজের চোখে দেখেছে এবং এটা আর কোন গোপন বিষয় নয়। এসব কথা জেনে ও শুনে আলহাজ ইসমাইল হোসেন চৌধুরী সাহেব একদম থ মেরে গেলেন।

বাড়িতে ফিরে এসেই তিনি ডাক দিলেন সবাইকে। থার্ডপণ্ডিত রেজা সাহেব তখন স্কুলে গিয়েছিলেন আর তাঁকে প্রয়োজনও ছিল না চৌধুরী সাহেবের। তাঁর ডাকে মৃধা সাহেব, নূরী, সোহাগী, চাকর-গরীবুল্লাহ ও বাড়ির আরো অনেকেই

চলে এলেন তার কাছে। সবাই এসে হাজির হলে, তিনি তাদের উদ্দেশ্য করে বললেন— এ সব কী শুনছি? থার্ডপণ্ডিত ঐ রেজা সাহেব কি এখন বাড়িতে থাকে না সকাল-বিকেল? মানে, স্কুল থেকে ফিরে আসে না স্কুলের ছুটির পরেই?

সবার আগে জবাব দিলো কাজের মেয়ে সোহাগী। সে বললো— না হুজুর। এখন কয়দিন ধরে ঠিকমতো ফিরে আসছেন বটে, কিন্তু এর কিছুদিন আগে মাঝে মাঝেই আসতেন না ছুটির পরেই। বিকেলের চা-নাশতা নিয়ে গিয়ে প্রায়ই আমাকে ফিরে আসতে হয়েছে।

হুঁউ! কোথায় যায় বা যেতো, তা কি কিছু জানো?

না হুজুর! সে সব এই আপামণি ভাল জানেন।

নূরীর প্রতি ইংগিত করলো সোহাগী। চৌধুরী সাহেব নূরীকে প্রশ্ন করলেন— কী জানো তুমি?

নূরী বললো— আমি নিজে তো কিছু দেখিনি। সবই আমার শুনা কথা। পণ্ডিত সাহেব নাকি মাঝে মাঝেই সাঁওতালপাড়ায় মাধব সাঁওতালের বাড়িতে যান— একথা আমি শুনেছি।

কার কাছে। শুনেছো?

: অনেকের কাছে। এখন জানতে পারছি, অনেকে তা দেখেছে। এই গরীবুল্লাহ চাচাও একদিন নিজের চোখে দেখে এসেছে ব্যাপারটা।

গরীবুল্লাহ নিজের চোখে দেখেছে? তা গরীবুল্লাহ, কি দেখেছো তুমি?

গরীবুল্লাহ বললো— আমাদের লাল বলদটাকে খুঁজতে আমি ওখানে গিয়েছিলাম হুজুর। দেখলাম, মাধব সাঁওতালের বৈঠকখানায় মাধব সাঁওতালের মেয়ে কৃষ্ণা আর আমাদের পণ্ডিত সাহেব মুখোমুখি বসে গল্প করছেন আর খুব হাসাহাসি করছেন।

ওখানে কি অন্য লোক কেউ ছিল?

না হুজুর, আর কাউকে দেখিনি ওখানে।

হুঁউ! ঐ একদিনই দেখেছি হুজুর। কিন্তু এখন তো দেখছি এ ঘটনা আরো অনেকেরই জানা। মানে, কৃষ্ণার সাথে গল্প করতে, কৃষ্ণার বাপের সাথে গল্প করতে আর ওদের উৎসবে ঘুরে বেড়াতে পণ্ডিত সাহেবকে আরো অনেকেই দেখেছেন।

বটে! এর অর্থ, ঐ ঘটনা অনেকদিন ধরেই চলছে।

এবার কথা বললেন নূরীর মামা মৃধা সাহেব। তিনি বললেন— অনেকদিন ধরেই— অনেকদিন ধরেই। দু'একদিনের ঘটনা হলে কি এতটা জানাজানি হয়?

চৌধুরী সাহেব বললেন— আচ্ছা, তাহলে একথা তোমার কানেও পড়েছে?

মৃধা সাহেব বললেন— আগে তেমন না পড়লেও এখন তো বন্যার মতো এসব কথা এসে ঢেলে পড়ছে কানে আমার। পণ্ডিতের এই চরিত্র নিয়ে অনেকেই ইতোমধ্যে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন।

যেমন?

ও পাড়ার ঐ করিম বকশো সাহেবকে দেখলাম, বেজায় খাপ্লা। তিনি রীতিমতো ফুঁসছেন। পণ্ডিত সাহেবের জাতিগোত্র নিয়েও তিনি প্রশ্ন তুলেছেন সরাসরি।

নামে মুসলমান হলেও আসলে উনি হিন্দু না খ্রিস্টান, উনার মধ্যে ইসলামী চিন্তা-চেতনা বা ইসলামের আদৌ কোন অস্তিত্ব আছে কি-না- এসব প্রশ্ন তুলেছেন।

তার অর্থ উনিও, মানে ঐ বকশো সাহেবও ঘটনাটা ভালভাবে জানেন।

: ভালভাবেই— ভালভাবেই। আমাদের চেয়ে অনেক বেশি জানেন দেখলাম। মাধব মোহন্তের মেয়ে কৃষ্ণার সাথে অবৈধ সম্পর্কের ব্যাপারসহ পণ্ডিতের তাড়ি-মদ খাওয়ার ব্যাপারটাও তিনি যেন আর অবিশ্বাস করতে পারছেন না। তাঁর কথাবার্তায় এই রকমই মনে হলো।

দম ধরে কিছুক্ষণ নীরব থাকার পরে সজোরে নিঃশ্বাস ছেড়ে চৌধুরী সাহেব বললেন— শুধু এইটুকুই নয়, আমি আরো শুনেছি। শুনেছি, শুধু ঐ তাড়ি-মদ খাওয়াই নয়, পণ্ডিত নাকি নিজেই সাঁওতাল বনে যাচ্ছে আর মাধব সাঁওতালের মেয়ে ঐ কৃষ্ণাকে শাদি করছে অচিরেই।

নূরী সশব্দে এর প্রতিবাদ করে উঠলো। বললো— মিথ্যা কথা। এসব অতিরঞ্জিত আর বদলোকের বানোয়াট কথা। ঘোর রটনা। এর কোন অর্থও নেই, অস্তিত্বও নেই।

চৌধুরী সাহেব বললেন— হ্যাঁ, এসব যে বদলোকেরই কথা আর অতিরঞ্জিত কথা— এটা আমিও বিশ্বাস করি। কিন্তু এর কোন অর্থ বা অস্তিত্ব নেই, এটা বিশ্বাস করিনে।

নূরী বললো— ঐ জাত দেয়া আর শাদি করা বাদে অন্য রটনাগুলোর যে অস্তিত্ব কিছু আছে, আমিও তা জেনেছি বাপজান। কিছুদিন আগে পর্যন্ত উনি মাঝে মাঝেই ঐ সাঁওতালপাড়ায় যেতেন আর কৃষ্ণার সাথে গল্প করতেন— এ কথা মিথ্যা নয়। কিন্তু কৃষ্ণাকে উনি বিয়ে করছেন— জাত দিচ্ছেন— এটা কখনো সত্যি নয়।

জবাবে মৃধা সাহেব বললেন— পুরোটা সত্যি না হলেও, যতখানি সন্দেহাতীতভাবে সত্যি, সেইখানিই ক্ষমার অযোগ্য। একজন শিক্ষক মানুষ— মুসলমান মানুষ— সে কিনা সাঁওতাল পাড়ায় গিয়ে পড়ে থাকবে আর একটা সাঁওতালের মেয়ের সাথে— উঃ এটা কি চিন্তা করা যায়?

চৌধুরী সাহেবও ক্ষোভের সাথে বললেন— না-না, একদম চিন্তা করা যায় না। এটা কল্পনারও অতীত। এমন একটা বেয়াড়া ছেলেকে জেলা শিক্ষা অফিসার সাহেব আমাদের ঘাড়ে এনে কেন যে চাপালেন, তা কিছুই বুঝে উঠতে

পারছিলে।

মৃধা সাহেব বললেন- স্কুলে চাপলো, চাপুক। বদনাম হয় সবারই এক সাথে হবে। আমাদের এককভাবে হবে না। কিন্তু লোকটা এসে এই বাড়িতে চেপে বসায়, অন্যের কাছে মুখ দেখানো দায় হয়ে পড়েছে এখন।

চৌধুরী সাহেব বললেন- সে দোষ তো তোমাদেরই। চেনা নেই, জানা নেই, কেন যে একে সরাসরি বাড়িতে এনে তুললে তোমরা- তা তোমরাই জানো।

মৃধা সাহেব আমতা আমতা করে বললেন- সে দোষ দিতে গেলে, এখন এই নূরীকেই বেশি করে দিতে হয়। সে যদি জিদ ধরে না বসে। তাহলে কি এই একটা বেশরা-বেদাত লোককে বাড়ি পর্যন্ত টেনে আনি?

আবার প্রতিবাদ করলো নূরী। বললো- বাহ বিপদ দেখেই বেশ তো সবদোষ আমার ঘাড়ে চাপাচ্ছেন। কিন্তু এই ক'দিন আগেই তো পণ্ডিত সাহেবের একনিষ্ঠ ইসলামী জীবনযাত্রা আর চাল-চলনের প্রশংসায় মুখর ছিলেন সবাই আপনারা। সে চাল-চলন আজও তো তেমনি আছে। নিরপেক্ষ নজরে দেখলে, এখনও তাঁর সে প্রশংসা সবাইকে করতে হবে আপনাদের। এই বয়সের এমন পরহেজগার আর এবাদত বন্দেগিতে এমন নিষ্ঠাবান লোক কয়টা দেখা যায় এ যুগে? এমন ইসলামসম্মত আদব-আখলাক, আচরণ কয়জন লোকের মধ্যে পাওয়া যায়?

মৃধা সাহেব বললেন, সম্পূর্ণ সত্য। তোমার একথা আদৌ মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত নয়। কিন্তু আমরা নিজেরা এটা বুঝলেও অন্যের মুখ ছাদি কি করে? সাঁওতালপাড়ার ভূত তার ঘাড়ে চেপেই তো তামাম দুখে গোচানা পড়ে গেছে। এ লোকের যে চরিত্র এখন বাইরে প্রকাশ পেয়েছে সে চরিত্র আর কোন যুক্তির বলেই আড়াল করা যাবে না। এ লোককে বাড়িতে রাখা নিয়ে এখন মহাসমস্যা হলো আমাদের দেখছি। এর জন্যে গাঁয়ে আমাদের একঘরে হতে না হয়।

এ কথায় অনেকে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। চৌধুরী সাহেবও সন্ত্রস্তকণ্ঠে বললেন-
এঁা, কি বললেন?

শ্যালক আহসান আলী মৃধা সাহেব বললেন- গাঁয়ের নানাজন নানা কথাই বলছে। সাধারণ লোকজনের মধ্যে কেউ কেউ এ কথাও বলছে যে বড়লোকের ব্যাপার বলে কেউ কিছু বলছে না। এ রকম লোক আমাদের বাড়িতে থাকলে, কবে আমাদের একঘরে করে ছাড়তো।

আহসান আলী!

পণ্ডিতকে না হয় জবাব দিয়েই দিই, না কি বলেন? বলে দিই- তোমাকে স্থান দিতে আর আমরা পারছিলে।

তাই বলে দেবে?

www.boighar.com

এ ছাড়া তো আর উপায় কিছু দেখছিলে।

প্রতিবাদের ধারা অব্যাহত রেখে নূরী বললো- তাহলে এই বিদেশে বিভূঁইয়ে

লোকটা যাবে কোথায়?

মৃধা সাহেব বললেন- জাহান্নামে যাক। বোর্ডিং-হাউস বা অন্য কারো বাড়িতে যাক, আমরা তো অপবাদ থেকে বাঁচি।

তাহলে জেলা শিক্ষা অফিসার সাহেবকে কী বলবেন মামুজান? তাঁর মনোনীত লোককে বাড়িতে এনে আবার এইভাবে বাড়ি থেকে বের করে দিলে তাঁর সামনে মুখ দেখাবেন কী করে?

সে দায় আর আমাদের নেই। এমন একজন 'হ-য-ব-র-ল' লোককে যিনি মনোনীত করে দিতে পারেন, তাকে সম্মিহ করার সে গরজ আর আমাদের নেই।

বাঃ! রাতারাতি আপনারা মত পাল্টাতে পারেন দেখছি!

মৃধা সাহেব রুষ্টকণ্ঠে বললেন- নূরী!

নূরী অবিচলকণ্ঠে বললো- যে শিক্ষা অফিসারের ব্যক্তিত্ব, চরিত্র, নীতি, আদর্শ- ইত্যাদি নিয়ে দুই দিন আগেও আপনারা প্রশংসার ঝড় তুলেছেন সর্বত্র, আর চিলে কান নিয়ে গেছে এমন একটা গুজব শুনেই তাঁর বদনাম শুরু করেছেন? কানে আগে হাত দিয়ে দেখবেন না? তাঁর নির্বাচিত লোকটার যে বদনাম রটেছে, তার সত্যতা যাচাই করে দেখবেন না?

অর্থাৎ?

সাঁওতালেরাও মানুষ। অন্যে যতই ভদ্র বা পরহেজগার হোক, মানুষের কাছে মানুষ তো যেতেই পারে। নানা কারণে গল্প, আলাপ, হাসি-ঠাট্টা করতেও পারে নানা জাতের নারী পুরুষের সাথে। এতে করে তাঁর ঈমানের কতখানি হানি হলো, ঈমানটা তাঁর একেবারেই ছিঁড়ে-ছুটে গেল কিনা- এ ব্যাপারে চূড়ান্তভাবে নিশ্চিত হওয়াটা কি প্রয়োজন মনে করেন না?

নিশ্চিত হতে বাকি আছে কিছু কি? এতজনে এতকথা বলছে-

বলবেই। আমরা এ দেশের মানুষেরা, ভাল কিছু করতে তেমন পারিনে। তবে তিলকে তাল বানাতে আমরা প্রত্যেকেই ওস্তাদ। ঐ তালটা আসলেই তাল, না তিল, তা কি খতিয়ে দেখবেন না?

নূরীর মুখের দিকে পলকখানেক চেয়ে থাকার পর মৃধা সাহেব বললেন- তার মানে! এখনও তুমি বিশ্বাস করো, ঐ লোকটাকে?

করি। সাঁওতালপাড়ায় তাঁর যাতায়াতটা সমর্থন করিনে- এটা ঠিক। কিন্তু সাঁওতালদের কাছে তাঁর জাত দেয়া আর কৃষ্ণাকে শাদি করা- এসব আদৌ বিশ্বাস করিনে।

করো না?

না। তাঁর সার্বিক আচরণ দেখে তাঁর চরিত্রটাকে এতটা ঠুনকো বলে ভাবতে পারিনে। কিছুতেই।

তাহলে তুমি লোকটাকে এখনও এই বাড়িতেই স্থান দিতে চাও? তোমার সুস্পষ্ট বক্তব্যটা কী?

আমার বক্তব্য হলো, নিশ্চিত হওয়ার আগে স্থান দিয়ে তাঁকে আবার বের করে দেয়াটা আমার কাছে একটা গ্লানির ব্যাপার। তা ছাড়া এই পরিবারের একটা ঐতিহ্য আছে বিপদে আপদে আশ্রিতজনকে রক্ষা করাই এই পরিবারের ঐতিহ্য। সে চেষ্টা না করে তাকে বের করে দেয়ার কোন রেকর্ড এই পরিবারে নেই।

নূরী!

সেরেফ লোক নিন্দার ভয়ে আমাদের এতটা ভেঙে পড়া ঠিক নয়। জাত যদি দেনই উনি বা বিয়ে করেন কৃষ্ণাকে, উনি নিজেই তো তাহলে আপছে আপ বেরিয়ে যাবেন এখন থেকে। এখন থেকে বেরিয়ে না গিয়ে তো ওগুলো কিছুই করা সম্ভব নয়। আমরা কেন খামাখা বের করে দেয়ার বদনাম নিতে যাবো?

এ যুক্তির বিরুদ্ধে মৃধা সাহেব আর কোন কথা খুঁজে পেলেন না। মতামতের জন্যে তিনি ভগ্নিপতির মুখের দিকে তাকালেন। ভগ্নিপতি চৌধুরী সাহেব এতক্ষণ মুগ্ধ হয়ে নূরীর সারগর্ভ কথাগুলো শুনছিলেন। মৃধা সাহেব তাঁর মুখের দিকে তাকালে চৌধুরী সাহেব বললেন— বিলকুল ঠিক। নূরী ঠিক কথাই বলেছে। ও বদনাম নেয়ার পরিস্থিতি এখনও আসেনি।

দুলাভাই!

আগে দেখা যাক পানিটা কতদূর গড়ায়।

৬

থার্ডপণ্ডিত আমির রেজা সাহেব ইদানীং সাঁওতাল পাড়ায় যাতায়াতটা বন্ধ করায় উত্তপ্ত পরিবেশটা অনেকখানি শীতল হয়ে এসেছিল। কিন্তু এই শীতল পরিবেশ দুটো দিনও টিকলো না। সাঁওতাল পাড়ার মুরারী সাঁতালের, অর্থাৎ মুরারী মোহন্তের অকস্মাৎ মারমুখী আবির্ভাব আবার দাউ দাউ করে জ্বালিয়ে তুললো সেই স্তিমিত আগুনটা। একসাথে লাঠিতে আর একজন কিশোরের কাঁধে ভর দিয়ে নূরীদের, অর্থাৎ আলহাজ ইসামাইল হোসেন চৌধুরী সাহেবের বাড়িতে এসে হঠাৎ হাজির হলো বৃদ্ধ ও অসুস্থ মুরারী সাঁতাল। চৌধুরী সাহেবের বাইরের আঙ্গিনায় পা দিয়েই সে সমানে চিৎকার জুড়ে দিলো— কই? কুতায়? কুতায় ছেই পণ্ডিত? হামার মাথায় আগুন জ্বলাই দিই ছালে পণ্ডিত কুতায় লুকাইলেক বটে? আছিয়াছে? পণ্ডিত কি মকানে আসিয়াছে? পণ্ডিত হই পণ্ডিত—

মুরারী মোহন্তের এলোপাতাড়ি চিৎকারে বাইরে ছুটে এলেন বাড়ির প্রায় সকলেই— চৌধুরী সাহেব, মৃধা সাহেব, গরীবুল্লাহ, সোহাগী, নূরী ও আরো অনেকে অন্দর থেকে তড়িঘড়ি বেরিয়ে এলেন বাইরের আঙ্গিনায়। আসতে আসতে চৌধুরী সাহেব উচ্চকণ্ঠে বললেন— কে, বাইরে এমন চিৎকার করে কে?

তাঁদের সবার দিকে এক ঝলক তাকিয়েই মুরারী মোহন্ত ফের সশব্দে বলে উঠলো- লাই লাই, তুমাদের হামি ডাকি লাই বটে। হামি পুণ্ডিতকে চাই। হামার দুছমন উই পুণ্ডিতকে বোলাও।

একসাথে লাঠি আর মানুষের উপর ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে থাকা মুরারী মোহন্তকে নিজের বাইরের আঙ্গিনায় দেখে অবাক হলেন চৌধুরী সাহেব। এমন একজন রুগ্ন আর হাড়িসার বৃদ্ধকে উদ্যোগ গায়ে দণ্ডায়মান দেখে বিস্মিত হলেন উপস্থিত অন্য সকলেই।

মুরারী মোহন্ত সাধারণত ঘরকুনো মানুষ। ঘোর আত্মকেন্দ্রিক লোক। নিজের ঘর সংসারের বাইরের আর কিছুই সে বুঝে না। ঘরসংসারের কাজে তার পান থেকে চুন খসার জো নেই। এর বাইরের উৎসব-অনুষ্ঠান শালিশ-দরবার, দেশের কাজ, দেশের কাজ- কোন কিছুতেই তেমন একটা পাওয়া যায় না তাকে। এর সাথে হুঁশেও সে খানিকটা খাটো। ইদানীং অধিক বৃদ্ধ হওয়ায় আর অসুস্থ হয়ে পড়ায় বাড়ির বাইরে আর সে বেরোই না বড় একটা। হাটে-ঘাটেও তেমন আর যায় না। স্বভাবে রগচটা।

এই মুরারী মোহন্ত হঠাৎ তাঁর বাড়িতে এসে চড়াও হওয়ায় একটু ভড়কেই গেলেন চৌধুরী সাহেব। মুরারীর কথার জবাবে তিনি বললেন- পণ্ডিত কোন পণ্ডিত?

চৌধুরী সাহেবকে লক্ষ্য করে মুরারী মোহন্ত আরো একটু ঝুঁকে পড়ে বললো- পেন্নাম হই চৌধুরী সাহেব। হামি পুণ্ডিতরে চাই।

পুণ্ডিত মানে? কার কথা বলছো তুমি?

হাইরে বা! উহারে চিনিলেক লাই। হাপনাদের ইস্কুলের ঐ লতুন পুণ্ডিত বটে। কয়েক মাছ আগারী উত্ত পুণ্ডিত লতুন ইস্কুলে আছিলেক। উহারে হামি চাই।

কে, আমাদের থার্ডপণ্ডিত আমির রেজা সাহেব,

হা-হা! ওহি-ওহি-ওহি রেজা পুণ্ডিত বটে। হামি ছুনিয়াছি, উ পুণ্ডিত হাপনার মকানে থাকে বটে। খোড়া উহারে ভেজিয়ে দিন।

কেন, ওকে তোমার কী দরকার।

হাতের লাঠি মাটিতে ঠুকে মুরারী মোহন্ত সগর্জনে বললো- উহারে হামি খুন করবেক, বটে। বিলকুল খুন। ছাড়িয়া কুতা বুলবেক লাই, হুঁ।

মুরারীর কথা শুনে উপস্থিত সকলেই হতবাক। চৌধুরী সাহেব সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন- কি বললে? খুন করবে?

আলবত। ছালে লোগ পালাইবে কুতায়? ইস্কুলে আছি উহারে হামি পাইলেক লাই। ছুবাই বুললো, ইস্কুল ছুটি হই গেইচে আর উও পুণ্ডিত চৌধুরী ছাহাবকো মকানে চলি গেইচে সিধা। ওহি বাত্ ছুনি হামি ভি সিধা ইখানে,

আছিয়াছে। বোলাইয়ে চৌধুরী ছাহেব, উহারে বোলাইয়ে জলদি।

কেন, পণ্ডিতের কসুরটা কী?

জব্বোর কছুর। উ পুণ্ডিত একঠো বজ্জাত আদমী আছে বটে। ছয়তান আদমী। উ ছয়তান হামার ছাতে বহুত দুছমনি করিয়াছে।

দুশমনি করেছে?

তোমার সাথে কি দুশমনি করলো?

উ হারামি হামার বহুরে ভাগাই লিচে বটে। বিলকুল ছিনাই লিচে।

চৌধুরী সাহেব বিস্মিতকণ্ঠে বললেন- তোমার বহুরে মানে? তোমার স্ত্রীকে, মানে তোমার বিবিরে?

মুরারী বললো- হঁ-হঁ, ওহি বাত্। হামার বিবিরে বটে।

কি তাজ্জব! তোমার বিবি। তোমার বিবি এলো কোথেকে? তোমার বউ তো অনেক আগেই মারা গেছে?

মরুক-মরুক, উও বুঢ়ি বিবি মরুক। হামি উও বুঢ়ির কুতা বুলচেক লাই। হামি বুলছে হামার লয়া বহুর কুতা।

নয়া বহু! তুমি আবার শাদি করেছে নাকি?

লাই-লাই, আভিতক করি লাই। উই বহু হামার হবু বহু আছে।

চৌধুরী সাহেবের বিস্ময় উত্তরোত্তর বাড়তে লাগলো। বললেন- হবু বহু! কে তোমার হবু বহু?

উও কৃছনা। মাধব মোহন্তের বেটি কৃছনা হামার হবু বহু আছে।

: বলো কি! ঐ কৃক্ষা? মাধব মোহন্ত তোমার সাথে তার মেয়ের বিয়ে দিতে রাজি আছে?

রাজি তো জরুর ছিল বটে। হামার ছাতে উহার বেটির ছাদি দেয়ার লাইগা উ মোহন্ত হামারে বহুত খুছামোদ করিয়াছে। বহুত মিনতি করিয়াছে।

মিনতি করেছে? তাজ্জব। তুমি একদম বৃদ্ধ লোক। মাধবের বেটি জোয়ান লেড়কি। ওকে তোমার সাথে শাদি দেয়ার জন্য মাধব তোমাকে খোশামোদ করেছে। এ তুমি কি বলছো?

www.boighar.com

কোরবেক-কোরবেক, জরুর কোরবেক। হামার বহুত জমিন আছে বটে। ছাট বিখাছে জিয়াদা জমিন। হামার কুয়ী-রিপ্তেদার নাহি আছে। হামি মরি যাইবেক তো উক্ত তামাম জমিন কৃছনা পাইবেক। বাল্কে মাধব পাইবেক। এত্না জমিন ছে আর কুতাও পাইবেক লাই। মাধব রাজি হইবেক লাই কেনে কইয়ে?

ও আছা। তোমার ঐ জমাজমির লোভে মাধব তোমাকে জামাই করতে চায়?

ওহি বাত্-ওহিবাত্ । একদম সাচ্বাত্ ।

তা তো বুঝলাম । কিন্তু তুমি এ বয়সে শাদি করে করবে কি? তুমি তো এখন ভালভাবে চলাফেরাও করতে পারো না । বিমারী মানুষ তুমি—

মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে মুরারী মোহন্ত বললো— উস্লিয়ে-উস্লিয়ে হামি বিমারী মানুষ আছে । লেकिन হামার খেদমত করিতে কেহু নাই । উস্লিয়ে কছনারে হামার বহুত দরকার বটে ।

তা সেজন্যে কৃষ্ণগারে কেন? অন্য যে কোন আউরাতকে শাদি করলেও তো পারো?

নেহি-নেহি । উ কছনারে হামার বহু পছন্দ বটে । উহারে জিয়াদা হামার মুনে ধরিয়াকে, হাঁ ।

ও বুঝেছি । তা আমাদের পণ্ডিত তোমার কি করেছে?

: উ বজ্জাত আদমী হামার ছাদি ভাঙ্গিয়ে দিয়াকে । কছনা হামারে ছাদি করিতে আখুন লারাজ । উহার বাপ ভি একদম লারাজ ।

কেন, নারাজ হলো কেন?

উ হারামী পুণ্ডিত ভাঙানী দিলো বটে । বাপ-বেটি দুনো আদমীকে ভাঙানী দিলো আওর দুটো আদমী লারাজ হই গেল ।

তা পণ্ডিত ভাঙানী দিতে গেল কেন? তার কি গরজ?

জব্বোর গরজ । উও বদ আদমী কছনারে ছাদি করিবে-ইস্লিয়ে ভাঙানী দিলো ।

সেকি! এ তুমি কি বলছো? কৃষ্ণগার বাপ কৃষ্ণগাকে ঐ পণ্ডিতের সাথে শাদি দেবে কেন । পণ্ডিত তো মুসলমান ।

দেবে-দেবে । কছনার বাপের ওহি খাহেছ হইয়াকে বটে । জব্বোর খাহেছ । মাধব হামারে জানাই দিছে—উ পণ্ডিত এলেমদার মানুষ । উহার বাত্ কায়েমী বাত্ আছে । এলেমদার বাত্ । মিঠা বাত্ । ছাত্ ছাত্, উও পুণ্ডিত বহুৎ আচ্ছা আদমী আছে । উ পুণ্ডিত হামার আওর হামার বেটি কছনার বহুত পছন্দ । ইছ লিয়ে তুহার ছাতে কছনার ছাদি হামি দেবেক লাই । কভ্ভি দেবেক লাই । ই ধান্দা তু ছাড়িয়া দে ।

এই কথাই বললো?

হঁ-হঁ, ছাফ ছাফ বুলিয়া দিলো । হামি মাধবেরে বহুত সমঝাইলেক । মিনতি করলেক । লেकिन মাধব হামারে সিধা 'না' বুলিয়া দিলেক বটে । ছাত্ ছাত্ মাধব হামারে অপমান করিল । উহার মকান থাকি হামাকে তাড়াই ভি দিলো ।

তাড়িয়ে দিলো?

কিমানজি কি করিয়া, তাই দিলেক বটে । উ মাধব কহিল, আখুন হামি

পুণ্ডিতরে পাইয়াছি উহার বাত হামার বহুত মিঠা লাগিয়াছে। তুহারে আর চায় কে? তু ভাগ। ভাগ্ যা জলদি।

আচ্ছা, এই ঘটনা?

হঁ-হঁ, এহি। উ পণ্ডিত কৃছনারে ছাদি করিবে। মাধব ভি উ পুণ্ডিতের ছাতে কৃছনার ছাদি দিবে। হামার হবু বহুরে বজ্জাত পুণ্ডিত ছাদি করিবে তো পুণ্ডিতের হামি ছাড়িয়া দেবে কেনে? উহারে হামি খুন করিবেক জরুর।

মোহন্ত!

পুণ্ডিত হামার বুকো তীর লাগাইছে বটে। হামারে খুন করি দিছে।

ক্ষোভে দুঃখে মুরারী মোহন্ত, নুয়ে পড়লো। তার চোখের কোণে পানি দেখা দিলো। এই সময় গরীবুল্লাহ বললো—পণ্ডিত তো জোয়ান আদমী মোহন্ত, তাগড়া জোয়ান। তুমি বুড়ো মানুষ। তুমি পণ্ডিতকে খুন করবে কি করে? বলে পারবে?

তড়াক করে মাথা তুলে মুরারী বললো— লাই পারবেক তো লাই পারবেক। আচ্ছা করি দু'বাত তো উহারে হামি ছুনাই দিতে পারবেক জরুর! জব্বোর দু'বাত। উহারে বোলাও তুম্, জলদি বোলাও—

গরীবুল্লাহ বললো—পণ্ডিত তো বাড়িতে নাই মোহন্ত। ছুটির পরে উনি বাড়িতে ফিরে আসেননি। আমি বোলাবো কোথেকে?

আছে লাই? মকানে আছে লাই?

না আসেনি।

তব্ ঠিক হয়, উহারে হামি পরে দেখিয়া লইবে। ছাড়িবেক লাই। চলরে মংলা, আভি ঘর চল। ছালারে হামি পরে আচ্ছা মতো বুড়া বাত ছুনাই দেবেক—হাঁ।

মুরারী তার সঙ্গী মংলারে ঠেলতে লাগলো। চৌধুরী সাহেব বললেন— হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই দেখে নিও মোহন্ত, পরে দেখে নিও। এখন যাও— বক বক করতে করতে বিদায় হলো মুরারী। অতঃপর উপস্থিত সবাইকে উদ্দেশ্য করে চৌধুরী সাহেব বললেন— এবার বুঝলে তোমরা ব্যাপারটা? ব্যাপারটা কত দূর গড়িয়েছে তা বুঝতে পারলে তো সবাই?

মৃধা সাহেব বললেন—তাজ্জব! আর তো অবিশ্বাস করার কিছু থাকে না। পণ্ডিত যে কৃষ্ণাকে শাদি করবে—এটাকে তো আর উড়ো খবর বলে গণ্য করা যায় না।

চৌধুরী সাহেব গম্ভীর কণ্ঠে বললেন— বোঝাও। এ কথাটা তোমরা আমাদের ঐ নূরীকে ভাল করে বুঝিয়ে দাও।

গোস্বামভরে সেখান থেকে চলে গেলেন চৌধুরী সাহেব। মুরারীর বক্তব্য শুনে সকলেই হতবাক হয়ে গিয়েছিল। আর কোন উচ্চবাচ্য না করে অন্যরাও আস্তে

আস্তে সরে গেলেন সেখান থেকে ।

মাগরিবের আজান হয় হয় । ঠিক এই সময় হস্তদন্ত হয়ে ঘরে ফিরলেন আমির রেজা সাহেব । ঘরে ঢোকার পথেই ঘটনাচক্রে আবার নূরীর সামনে পড়লেন তিনি । তাঁকে দেখেই নূরী তার দিকে কটমট করে তাকালো এবং দাঁতের উপর দাঁত পিষে বললো—ভণ্ড কাঁহাকার ।

এই কথাটা বলেই শাঁ করে ঘুরে দাঁড়ালো নূরী এবং দ্রুতপদে তৎক্ষণাৎ অন্দরে চলে গেল । আর একটা কথাও বললো না বা ফিরেও তাকালো না ।

মাগরিবের নামাজ আদায় করে রেজা সাহেব উঠে বসতেই চা-নাশতা হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকলো সোহাগী । চা-নাশতার আয়োজন আজ সামান্যই । কারণ, এদিকে নজর দেয়ার নূরীর আজ আগ্রহ আর অবসর কোনটাই ছিল না ।

সোহাগীকে দেখে রেজা সাহেব স্মিতহাস্যে বললেন—কি ব্যাপার সোহাগী, সবারই মুখ আজ গোমরা গোমরা দেখছি । পরিবেশটা থমথমে । কোন নতুন খবর আছে নাকি?

সোহাগী বললো—আছেই তো । সাঁওতালপাড়ার মুরারী সাঁওতাল একটু আগে এসেছিল । সে-ই সব ফাঁস করে দিয়ে গেল ।

ফাঁস করে দিয়ে গেল মানে? কি বললো?

বললো, ওর হবু বউকে কেড়ে নিয়ে আপনি নাকি বিয়ে করছেন— এই কথা । মাধব সাঁওতালের মেয়ে কৃষ্ণার সাথে নাকি ঐ বুড়োর শাদির কথার পাকাপাকি হয়ে ছিল— এ কি সত্যি?

হ্যাঁ, তা সত্যি ।

ঐ কথা । ঐ বিয়ে ভেঙে দিয়ে কৃষ্ণাকে আপনি বিয়ে করছেন—এই কথা সবাইকে জানিয়ে দিয়ে গেল ।

সবাইকে?

সবাইকে-সবাইকে । ঐ সাঁতালটার চিৎকারে বাড়ির সবাই বেরিয়ে এসেছিলেন । সবাই তার কথা শুনেছেন ।

তোমার আপা নূরীও ।

জি-জি, আপাও । আপনার উপর আপার বিশ্বাস ছিল জব্বোর । এরপর সে বিশ্বাস তাঁর আর আমান থাকার কথা নয় ।

হুঁট!

আচ্ছা হুজুর, আপনি-ই কামড়া করতে গেলেন কেন?

কোন কামড়া?

ঐ সাঁওতালের মেয়ে কৃষ্ণাকে শাদি করার জন্য আপনি এমন পাগল হয়ে উঠলেন কেন? ওর চেয়ে সুন্দরী মেয়ে কি আর কোথাও পেলেন না?

কই আর পেলাম। দশচক্রে ভগবান ভূত হয়ে গেলে, পাওয়ার ফাঁকটা আর থাকে কোথায়?

জি? ঠিক বুঝলাম না।

সেটা তোমার বোঝার দরকার নেই। আর সেটা বুঝতেও পারবে না। ওগুলো রেখে তুমি বরং এখন যাও, পরে এসে নিয়ে যেও।

তা না হয় যাচ্ছি। কিন্তু আপনি এ কামড়া করতে যাচ্ছেন কেন? শুনে অবধি নূরী আপা যে খাওয়া দাওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন।

আমার উপর তোমার নূরী আপার দরদটা বরাবরই বেশি। তাই দুঃখ পেয়েছেন উনি।

তবুও আপনি ঐ সাঁতালনীর পেছনে ছুটছেন কেন?

বললামই তো, ও তুমি বুঝবে না। তুমি যাও—

জি?

খেয়াল-খেয়াল, সবই খেয়াল!

দরজার দিকে তিনি অঞ্জুলি নির্দেশ করলেন। বিভ্রান্তভাবে অগত্যা বেরিয়ে গেল সোহাগী।

পরের দিনই হেডমাস্টার সাহেবের সাথে দেখা করলেন চৌধুরী সাহেব ও মৃধা সাহেব দুজনই। তাঁদের বক্তব্য শুনে হেডমাস্টার সাহেব ধীর কণ্ঠে বললেন—হ্যাঁ, এমন কথা আমিও ইদানীং কিছু কিছু শুনতে পাচ্ছি। বিশেষ করে স্টাফ রুমে শিক্ষকের কেউ কেউ এ নিয়ে জব্বোর হৈ চৈ করছেন। কিন্তু আমি এ সবে কখনো কারণ খুঁজে পাচ্ছি।

চৌধুরী সাহেব বিস্মিত কণ্ঠে বললেন—

সেকি! কারণ খুঁজে পাচ্ছেন না? চারদিকে এতটা হৈ হুল্লোড় হচ্ছে—

হেডমাস্টার সাহেব বললেন—

তা হোক। আমি নিজের বিবেকবুদ্ধিকে বিশ্বাস করবো না হুজুগে পাবলিকের হুজুগকে বিশ্বাস করবো, বলুন?

চৌধুরী সাহেব বললেন- অর্থাৎ?

হেডমাস্টার সাহেব বললেন-‘আমি তো তীক্ষ্ণ নজরে লক্ষ্য করছি থার্ডপণ্ডিত সাহেবকে। তাঁর আচরণ আর চালচলনের সাথে বাইরের ঐ হুজুগের আদৌ কোন মিল খুঁজে পাচ্ছি। এই থার্ডপণ্ডিত লোকটা একজন অত্যন্ত উঁচুমানের মুসলমান। মানুষ হিসেবে উনি একজন বড় মাপের মানুষ। তাঁর ঐ চালচলন আর আদব আখলাক সবার জন্যেই অনুসরণীয়। তাঁর চরিত্র, ব্যক্তিত্ব আর দায়িত্ববোধ আজও একটা আদর্শ হয়ে আছে আমার সামনে। এমন লোককে কেউ উচ্ছৃঙ্খল বা চরিত্রহীন বললেই তাদের সাথে আমিও তাই বলবো?

হেডমাস্টার সাহেব !

এই যে এত কথা এতদিকে হচ্ছে, তবু এই সব কথাবার্তা একটা ছাত্রকেও কি এতটুকু বিচলিত করতে পেরেছে? এই থার্ডপণ্ডিতের উপর স্কুলের তামাম ছাত্র ছাত্রীর প্রগাঢ় ভক্তি আর অবিচল আস্থা একটা অনন্য নজির স্থাপন করেছে। ঐ বিতর্কিত শিক্ষক আলেফ মিয়া যে তলে তলে থার্ড পণ্ডিত রেজা সাহেবের এই তথাকথিত দুর্নামের ইস্যুতে ছাত্রদের দ্বারা স্ট্রাইক করানোর এত চেষ্টা করলো, কিন্তু কই সে কি তা পারলো? আলেফ মিয়ার কথা কোন ছাত্রছাত্রী কানেই তুললো না আর তুলবেই বা কি? পণ্ডিতের যে নির্মল চরিত্র তারা নিজের চোখে দেখছে। বাইরের কেউ কোন হুজুগ তুললেই কি তারা তা বিশ্বাস করবে?

চৌধুরী সাহেব খতমত করে বললেন— বলেন কি! সত্যিই কি তাহলে বিচলিত হওয়ার কিছু নেই? মানে, আপনি কি তাই মনে করেন?

জি-জি, আমি তাই মনে করি।

: কিন্তু আমরা এদিকে ভড়কে গেছি বেজায়। ভাবছি, পণ্ডিত সাহেবকে আর বাড়িতে রাখা ঠিক হবে না। সামাজিক চাপটা চরমে ওঠার আগেই উনাকে স্কুলের বোর্ডিং হাউসে পাঠিয়ে দিই!

তা মনে করলে দিতে পারেন। তবে আমি বলবো, প্রথমে যখন দেননি, এখন তা দিয়ে আর অযথা সিন ক্রিয়েট করবেন না।

আহসান আলী মূধা সাহেব অধৈর্যভাবে বললেন— সিন ক্রিয়েট এ কি বলছেন আপনি? পণ্ডিতের অপকীর্তি প্রকৃষ্ট প্রমাণ এখন আমাদের বাড়ির উপর বয়ে আসা শুরু হয়েছে। পণ্ডিত যে ঐ মাধব সাঁওতালের মেয়েকে শাদি করবে এটা স্পষ্টভাবে জানাজানি হয়ে গেছে। এ কথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিতও হয়েছে। তবু তাকে বাড়ি থেকে সরালে সিন ক্রিয়েট করা হবে?

হেডমাস্টার সাহেব শান্তকণ্ঠে বললেন—হ্যাঁ মূধা সাহেব, আমি তাই মনে করি। কারণ শাদি করবেন—এই কথাটা প্রমাণিত হওয়া আর শাদি করাটা দুটো আলাদা জিনিস।

তার মানে?

চিলে কানটা নিয়ে আগে যাক, তার পরে না কথা!

মূধা সাহেব খতমত করে বললেন— হোয়াট ডু ইউ মিন?

হেডমাস্টার সাহেব স্থিতহাস্যে বললেন—ওয়েট এণ্ড সি টু দি লাস্ট।

৭

আমজাদ হোসেন ক্লাস টেনের ছাত্র। অত্যন্ত মেধাবী হলেও সে নিতান্তই গরিব। স্কুলে পড়ার মতো অবস্থা তার নয়। বই-পুস্তক, জামা-কাপড় তার ঠিকমতো জোটে না। দীন বেশে স্কুলে আসে। কোন কোন দিন অনাহারেও। অন্যদিকে আবার আচরণে সে খুবই আকর্ষণীয়। নম্র, ভদ্র আর ময়মুরকি ও

শিক্ষকদের প্রতি সে প্রগাঢ়ভাবে শ্রদ্ধাশীল। সহপাঠীদের সাথেও কোন কলহে যায় না সে। ঝগড়া-ফ্যাসাদ এড়িয়ে চলে। সব চেয়ে বড় কথা, সে পুরোপুরি ইসলামমুখী ছেলে আর ছাত্র-শিক্ষক সকলেরই সে চেনা। টিফিন পিরিয়ডে ছাত্রদের নামাজের জামাতে প্রতিদিনই এই আমজাদ হোসেন আজান দেয়। আকামতও দেয় সে। নামাজে ইমামতি করেন কোন কোন দিন হেডমাস্টার সাহেব আর অধিক দিন থার্ডপণ্ডিত রেজা সাহেব। কিন্তু আজান আকামতের বেলায় আমজাদ হোসেন একাই। প্রতিদিন সে-ই আজান-আকামত দেয়।

এই সমস্ত গুণাবলির কারণে আমজাদ হোসেন প্রথমদিন থেকেই নজর কেড়েছে থার্ডপণ্ডিত আমির রেজা সাহেবের। রেজা সাহেব এখন তাকে ভীষণ স্নেহ করেন আর অভিভাবকের মতো আচরণ করেন। তার সাথে আমজাদ হোসেনের ছোটখাটো চাহিদাগুলোও পূরণ করার চেষ্টা করেন তিনি। স্বাভাবিক কারণেই আমজাদ হোসেন এই শিক্ষকের প্রতি সর্বাধিক শ্রদ্ধাশীল। বিভিন্নভাবে তার উপর নির্ভরশীলও বটে।

আজও টিফিন পিরিয়ডের নামাজের জামাতে আজান ও ইকামত দিলো আমজাদ হোসেন। জামাতে ইমামতি করলেন রেজা সাহেব। নামাজ শেষে সবাই ওঠে গেলেও আমজাদ হোসেন ও রোজা সাহেব পাশাপাশি বসে রইলেন কিছুক্ষণ। এই ফাঁকে আমজাদ হোসেন রেজা সাহেবকে বললো— স্যার আজকের শেষ পিরিয়ডটা আপনার। ঐ পিরিয়ডটার জন্যে আমি ছুটি চাই স্যার। আজ আমি থাকতে পারবো না ঐ পিরিয়ডে।

রেজা সাহেব বললেন— কেন, কাজ আছে বাড়িতে?

আমজাদ হোসেন বললো—জি স্যার। আরো আগে বাড়িতে যাওয়া উচিত ছিল আমার। আমরা তো আজ স্কুলে আসতেই বারণ করলেন। তবু না এসে থাকতে পারলাম না। সকাল সকাল ফিরে যাবো, এই কথা বলে চলে এসেছি।

তা বেশ তো। জরুরি কাজ থাকলে অবশ্যই যাবে। ছুটি চাইলে তোমাকে ছুটি না দেবেন কে?

www.boighar.com

হ্যাঁ স্যার। আগামীকালের জন্যে ছুটি নিয়েছি হেডস্যারের কাছ থেকে। আগামীকাল আর আসতেই পারবো না স্কুলে।

আসতেই পারবে না।

না স্যার। আগামীকালই নয় শুধু, তারপরে হয়তো আর কোনদিনই স্কুলে আসতে পারবো না। আমাকে হয়তো অন্যের বাড়িতে হাল-কিষানের চাকরি নিতে হবে।

বলতে বলতে ঝুঁকে পড়লো আমজাদ হোসেনের মাথা। চোখমুখটা বেজায় কালো হয়ে গেল। কণ্ঠস্বরও কেঁপে উঠলো শেষের দিকে। রেজা সাহেব চমকে উঠে বললেন— হাল-কিষানের চাকরি নিতে হবে মানে? হঠাৎ করে এতটাই

গরজ পড়ে গেল যে, তোমাকে অন্যের বাড়িতে হাল-কিষানের চাকরিতে ঢুকতে হবে?

এতদিন পড়েনি স্যার। আগামীকাল থেকে হয়তো সেই গরজটাই চরমভাবে দেখা দেবে।

আগামীকাল থেকে! ঘটনা কি খুলে বলো তো?

আগামীকাল আমার বোনের বিয়ে স্যার। দুঃখু-ধান্দা করে এ যাবৎ আমার আত্মা আমার আর আমার বোনের ভরণপোষণটা কোনমতে চালিয়ে আসছেন। কিন্তু আগামীকাল বোনের বিয়েতে এতটাই বরপণ দিতে হতে পারে যে, তাতে আমাদের সর্বস্ব চলে যাবে। আহা! জোটার আর কোনই সংস্থান থাকবে না। কাজেই আমাকে উপার্জনে নামতে হবে অবশ্যই। হয় দিনমজুরি, নয়তো মাসভিত্তিক পাইট কিষানের চাকরি।

বলো কি! বরপণ? তাও আবার খুব বেশি?

জি স্যার, আমাদের জন্যে খুবই বেশি। সম্বল বলতে আমাদের বিঘে দেড়েক জমি আছে মাঠে আর কাঠা আষ্টেক জমির উপর মাথা গাঁজার খড়ের ঘর। ঐ দেড় বিঘের আবাদের সাথে দুধ বেচে, লাউ কুমড়ার গাছ লাগিয়ে, হাঁস-মুরগি পালন করে আর অন্যের কাঁথা সেলাই করে দিয়ে আমার আত্মা সংসার চালান কোন মতে। এই অবস্থায় বরকে দিতে হবে নগদ দশ হাজার টাকা আর ঘড়ি-আঙুটি-সাইকেল। গতকাল থেকে আবার শুনতে পাচ্ছি, টেলিভিশন চায় বর। এখন অবস্থাটা চিন্তা করুন আমাদের?

সীমাহীন বিশ্বয়ে আচ্ছন্ন হয়ে রেজা সাহেব বললেন, সে কি! এত তার চাহিদা?

জি স্যার। দুধের একটা গাই ছিল-সেটা বেচে, মাস-তিনেকের খোরাক ছিল— সেগুলো বেচে, হাঁস-মুরগিগুলো সবই বেচে দিয়ে দশ হাজার টাকা আর বিয়ের খরচটা কোন মতে জুটিয়েছেন আমার মা। ঘড়ি-আঙুটি-বাইসাইকেল ঐ পয়সায় হয়নি। ঐ দেড় বিঘে জমি বন্ধক দিয়ে ঘড়ি-আঙুটি-সাইকেল কেনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর উপর যদি টেলিভিশন দিতে হয় তাহলে ঐ বন্ধক পয়সায় কুলোবে না। জমিটা একদম বিক্রি করেই দিতে হবে।

বিক্রি করে দিতে হবে?

জি স্যার। যে বন্ধক নিয়েছে, সে ঐ জমিটা কিনে নিতে *আগ্রহী। টেলিভিশনের কথা এ যাবৎ ছিল না। গতকাল থেকে ঘটক মারফত এই বায়না ধরেছে বর। জমিটা যদি বিক্রি করেই দিতে হয়, তাহলে আর স্কুলে আসবো কী করে স্যার? হাঁস-মুরগি, গরু-বাহুর সব শেষ। ঐ জমিটাও গেলে আগামীপরশ থেকেই আমাকে দিন মজুরিতে নামতে হবে।

বিস্মিত নয়নে চেয়ে থেকে রেজা সাহেব বললেন— কি অসম্ভব কথা! এত

কিছু দিতে হবে কেন? কোন খুঁতটুত আছে নাকি তোমার বোনের? সে কি কানা-খোঁড়া এমন কিছু?

আমজাদ হোসেন সরবে বললো— না-না স্যার, না। ওসব খুঁত থাকা তো দূরের কথা, আমার বোন সালেহার মতো এত সুন্দরী মেয়ে আমাদের ঐ পাড়াতে আর একটাও নেই। এর উপর ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত সে পড়াশুনা করেছে। করেছে মানে, ক্লাস ফাইভ খুবই ভালভাবে পাস করে ক্লাস সিক্সে উঠেছিল।

বলো কি! এরপরও এত বেশি বরপণ?

উপায় কি স্যার? এর কমে তো পাওয়া যায় না বর। আমার বোন সালেহা লেখাপড়া জানা সুন্দরী মেয়ে হওয়ায়, ভাল ভাল ঘর থেকেও শাদির পয়গাম এসেছে। কিন্তু তাদের চাহিদা আরো বেশি। নগদ তিরিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার পর্যন্ত। এর সাথে সোনাদানা, আসবাবপত্র, মোটরসাইকেল— আরো কত কি?

তাই নাকি তোমাদের এখানে এমনই অবস্থা?

এমন অবস্থাই স্যার। এখানে বর ডাকে তুলে কেনা-বেচা হয়। অনেক বড়লোক আছে এ অঞ্চলে তো। এক একজনের নামে-বেনামে দুই-তিনশ' বিঘে জমি। তাঁরা চড়াদামে বর কেনা-বেচা করেন। ওদের দেখাদেখি আমাদের গরিবদের মধ্যেও এই রীতি চালু হয়ে গেছে।

আমজাদ হোসেন!

বর যদি কিছুটা লেখাপড়া জানে, তাহলে আর তার লেজে পা দেয় কে? সেই পা দিতে গিয়েই আমরা এই ফ্যাসাদে পড়ে গেছি।

তাই নাকি? এই বরটা তাহলে খুবই শিক্ষিত ছেলে?

শিক্ষিত বৈকি স্যার। ক্লাস টেন পর্যন্ত পড়েছে।

বার তিনেক পরীক্ষা দিয়ে এসএসসিটা পাস করতে পারেনি বলেই রক্ষে। পাস করতে পারলে কি আর তার কাছে ভিড়তে পারতাম আমরা?

আর একদফা তাজ্জব হলেন রেজা সাহেব। বললেন, সে কি! এসএসসি ফেল করা ছেলেকে খুবই শিক্ষিত বলছো তোমরা?

জি স্যার, তাই। এ অঞ্চলে শিক্ষিত লোক কম। সবাই জমি-জমা, আবাদ-বুনোদ আর হাল-লাঙ্গল নিয়ে ছোটকাল থেকেই ব্যস্ত। স্কুলের সংখ্যা এ অঞ্চলে কম। পড়তে যাওয়ার ছেলেপুলেও কম। যারাই কম বেশি লেখাপড়া শিখে, বিয়ের বাজারে তাদেরই এইভাবে কেনা-বেচা করা হয়।

কি তাজ্জব কথা বলছো তুমি!

তাজ্জব হবে কেন স্যার? আপনাদের ঐ ঢাকায় কি হয় তা জানিনে। এখানে একজন কাঠমূর্খ মুটে-মুজুরকেও বরপণ না দিলে সে বিয়ে করতে রাজি হবে

না। গত বছর ঐ কুঠিপাড়ার এক ফকিরের ছেলেকেও তিন হাজার টাকা বরপণ দিয়ে মেয়ে দিয়েছে আর এক ফকির।

রেজা সাহেব নীরব হয়ে গেলেন। তাঁকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকতে দেখে আমজাদ হোসেন ফের প্রশ্ন করলো, বিশ্বাস হচ্ছে না স্যার?

বিশ্বয়ের ঘোর কাটতেই রেজা সাহেব বললেন—এঁয়া! না-না, বিশ্বাস হবে না কেন? আমাদের ওখানেও এখন এসব কথা শুনতে পাই কিছু। রিকশাওয়ালা-ভ্যানওয়ালাও নাকি নগদ টাকা না পেলে বিয়ে করতে রাজি হয় না। দেশটার যে কি হলো!

স্যার—

ও হ্যাঁ, তোমাদের এই বর কী করে এখন? কোন চাকরি-বাকরি করে কি? না স্যার। পাস করতে পারেনি বলে এখনও কোন চাকরি-বাকরি পায়নি। এখন ঠিকা খাটে।

ঠিকা খাটে কেমন?

রাজমিস্ত্রির পেছনে যোগানদারের কাজ করে। প্রতিদিনের মজুরি থেকে দশ টাকা হারে রাজমিস্ত্রিকে দেয়ার চুক্তিতে সে বান্ধা যোগানদার হয়ে গেছে। যোগানদারের কাজে তাকে দৈনিক ডাকা হয়।

হুঁউ! তা বাড়ি কোথায় ঐ লোকটার? নামটা যেন কি ঐ বরের?

চান্দের আলী, স্যার। ও নিজেকে চাঁদ নামেই পরিচয় দেয়। আমাদের ঐ থানা শহরেই থাকে।

থানা শহর মানে?

থানাটা এখন প্রায় শহরের মতো হয়ে গেছে তো, তাই আমরা ওটাকে থানা শহরই বলি। পাকা বিল্ডিং, পাকা রাস্তা-ঘাট, অফিস, কাছারি মানে নানা কিছু। কাছে কোলে আর কোন শহর না থাকায়। ওটাই আমাদের কাছে শহর।

ও আচ্ছা। তা ঐ থানা শহরেই বাড়ি? চাঁদ মিয়ার কি বাড়ি আছে ঐ শহরে?

বাড়ি! না স্যার, চাঁদ মিয়ার নিজের কোন বাড়ি ঘর কোথাও নেই। ঐ থানা শহরের একজন মস্তবড় শিক্ষিত লোক বউ-বাচ্চা নিয়ে রাজশাহী শহরে চাকরি করেন। তাঁর বাড়ির এক অংশে উনার এক আত্মীয় থাকেন আর বাইরের দিকের এক ঘরে ঐ চাঁদ মিয়ারা থাকে। চাঁদ মিয়া আর তার মা-বাপ।

: বলো কি! পরের বাড়িতে থাকে। তবে শুনেছি, বিয়ের পরেই বাড়ি করবে একটা।

: বাড়ি করবে? জায়গা, ঠাই আর নির্মাণসামগ্রী কি কিনেছে? মানে, বাঁশ, কাঁঠ, ইট-সিমেন্ট এসব?

না-না, ওসব কিনবে কি দিয়ে? সবে তো ঐ যোগানদারের কাজটা

পেয়েছে। বলছে, যোগানদারের কাজ করেই সে বাড়ি করে ফেলবে অল্প দিনের মধ্যে। মাল-মসলা সব তার হাতে।

শুনে রেজা সাহেব একেবারেই 'থ' মেরে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে রুষ্ঠকণ্ঠে বললেন—তোমরা কি সবাই পাগল বনে গোছো? যার বাড়ি নেই, ঘর নেই, চাকরি-বাকরি কিছুই নেই, রাজমিস্ত্রীদের পেছনে মজুরি খাটে মাত্র, তার সাথে তোমার শিক্ষিত আর সুন্দরী বোনের বিয়ে দিচ্ছে সর্বস্ব বেচে-কিনে? তোমার আশ্মার কি জ্ঞান-বুদ্ধি কিছুই নেই?

জবাবে আমজাদ হোসেন ম্লান কণ্ঠে বললো— তা থেকেই বা উপায় কি স্যার? আমার বোন সালেহা বাড়ন্ত গোছের মেয়ে। দ্যাখ দ্যাখ করতে করতে বেশ বড় হয়ে গেছে। পাড়াগাঁয়ে সোমত্ত আর সুন্দরী মেয়ে ঘরে রাখা খুবই দায় স্যার। কখন কোন দুর্নাম রটে, তার ঠিক কি? আমার আশ্মা তো অনেক চেষ্টা করেই দেখলেন। কিন্তু এর চেয়ে সস্তা তো আর পাওয়া গেল না কাউকে।

কি তাজ্জব! সুন্দরী আর, কিছুটা হলেও শিক্ষিত মেয়ের বর তোমরা পেলে না? এমন মেয়ের দিকে স্বেচ্ছায় এগিয়ে এলো না কেউ? কারোরই মনে ধরলো না তোমাদের সালেহাকে?

এ কথার কোন জবাব না দিয়ে আমজাদ হোসেন মাথা নিচু করলো। নীরবে চেয়ে রইলো মেঝের দিকে। তা দেখে রেজা সাহেব ফের প্রশ্ন করলেন—কি ব্যাপার! হঠাৎ করে লাজভাব হয়ে গেলে যে?

আমজাদ হোসেন ক্ষীণকণ্ঠে বললো— কি জবাব দেবো স্যার? টাকা ছাড়া মনের কি দাম আছে কিছু?

আমজাদ!

মনে ধরার কথা কি বলছেন স্যার? আমাদের পাড়ারই এক ছেলে মনে প্রাণে ভালবাসে আমার বোনকে। বোনটাও তাকে খুবই ভালবাসে ছোটকাল থেকেই। কিন্তু ঐ যে বললাম—টাকা? টাকার প্রশ্নে তাদের ভালবাসা কোরবানি হয়ে গেল।

উৎসাহিত হয়ে উঠে রেজা সাহেব বললেন—এঁ্যা! কি বললে? তোমার বোনের সাথে ভালবাসা ছিল এক জনের?

আমজাদ হোসেন নিস্প্রভকণ্ঠে বললো— হঁ্যা স্যার। আমাদের পাড়াতেই তার বাড়ি?

কি নাম?

সালাউদ্দীন। সালাউদ্দীন আহমেদ।

www.boighar.com

কি করে সেই সালাউদ্দীন আহমেদ?

: এখনো কিছু করে না স্যার। সেকেন্ড ডিভিশনে এসএসসি পাস করে বাড়িতে বসে আছে। অল্পের জন্যে ফাস্ট ডিভিশন পায়নি। বাপের অবস্থাও খুব ভাল। কিন্তু বাপটা বড়ই কঞ্জুস। পয়সা খরচের ভয়ে ছেলেকে পড়াতে আর

শহরে পাঠালেন না। ওদিকে আবার একটি মাত্র ছেলে। চাকরি-বাকরি নিয়ে সে দূরে কোথাও চলে যাক, সেটাও তিনি চান না।

তাহলে কি ছেলেকে তিনি সেরেফ বসিয়ে রাখবেন বাড়িতে? মানে, পঙ্গু করে?

অনেকটা তাই। আমাদের পাড়ার উত্তর পাশেই রসুলপুর নামের বড়সড়ো এক গাঁ আছে। ওদিকে কখনো গেছেন কিনা জানিনে। ঐ গাঁয়ে স্যার বছর পাঁচেক হলো একটা প্রাইমারি স্কুল খুলেছে। মঞ্জুরি এখনো পায়নি। তবে পাবে পাবে করছে। সালাউদ্দীন ভাই ঐ স্কুলেই যাতায়াত করছেন এখন।

চাকরি হয়ে গেছে?

হয়নি। স্কুল কমিটি বলছে, চাঁদা দিতে হবে মোটা। মোটা চাঁদা দিলে তবেই তাঁকে ঐ স্কুলে নেয়া হবে। নতুন স্কুল। স্কুলটার মঞ্জুরি নিতে নাকি অনেক টাকার দরকার।

: আচ্ছা। তা সালাউদ্দীনের বাপের অবস্থা তো ভাল বলছে। চাঁদা দিতে কি রাজি আছেন তিনি?

আছেন। তবে কঞ্জুস মানুষ তো! তাই ঘর থেকে সেই চাঁদা দেবেন না। চাঁদাও কম নয়। পঁচিশ হাজার টাকা। তাই ছেলের বিয়ে দিয়ে ঐ চাঁদার টাকা যোগাড় করার তালে আছেন তিনি।

খেয়াল হতেই রেজা সাহেব ব্যস্তকণ্ঠে বলে উঠলেন— ওহো, কথায় কথায় আমরা অন্যদিকে চলে এসেছি। তা ঐ সালাউদ্দীনের সাথে তোমার বোনের শাদির কথা কি তোমরা কখনো ভুলেছিলে?

হ্যাঁ স্যার। সে চেষ্টা তো বরাবরই করা হয়েছে। কিন্তু ফল কিছু হয়নি। সালাউদ্দীন ভাইয়ের বাপের বিরাট চাহিদা। নগদ তিরিশ হাজার টাকা তাঁর চাই। এর এক টাকা কম হলে এ বিয়ে তিনি দেবেন না। অনেক অনুরোধ করে ব্যর্থ হওয়ার পরে অগত্যা এই চাঁদের দিকে, মানে এই চান্দে আলী চাঁদ মিয়ান দিকে হাত বাড়িয়েছি আমরা।

রেজা সাহেব স্বগতোক্তি করলেন—হ্যাঁ, হাত বাড়ানোর মতো চাঁদই বটে।

জি স্যার?

না, বলছি— সালাউদ্দীন নাকি খুবই ভালবাসে তোমার বোন সালেহাকে? সালেহার বিয়ে হচ্ছে দেখেও, সালাউদ্দীন কিছু বলছে না?

কি আর বলবেন? বাপকে যে সালাউদ্দীন ভাই ভীষণ ভয় করেন। তার উপর তিনি বেকার। গোপনে গোপনে কাঁদছেন আর উদাসীনের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বলছেন, “একটা চাকরি-বাকরি, কিছু যদি থাকতো আমার, তাহলে সালেহাকে নিয়ে আমি এখনই পালিয়ে যেতাম। বাপের ঘাড়ে আছি, করি কি আমি এখন?”

তাই নাকি? সালাউদ্দীনের আগ্রহ তাহলে এখনও আছে?

আছে তো বটেই? কিন্তু তার বাপের যে টাকা চাই। তার বাপ এখন বলছেন, তিরিশ হাজার লাগবে না, ঐ পঁচিশ হাজার টাকা তোমরাই দাও। ছেলের চাকরিটা হোক, আমি খুশি হয়ে তোমাদের সাহায্যে করে তুলে নেবো। কিন্তু এত টাকা আমরা কোথায় পাবো স্যার? চান্দেব আলীর চাহিদা মেটাতেই সর্বস্ব হারাতে বসেছি আমরা!

হ্যাঁ, সে তো ঠিকই। কিন্তু একটা কাজ করলে তো পারতে তোমরা? সালাউদ্দীনের বাপকে না ধরে, ঐ স্কুল কমিটির লোকদের ধরলেই তো পারতে তোমরা। চান্দেব আলীর পেছনে যে টাকা খরচ হচ্ছে, সেই টাকাটা তাঁদের দিয়ে সালাউদ্দীনের জন্যে চাকরিটা পাওয়ার অনুরোধ জানালেও তো পারতে। সালাউদ্দীনের বাপ যখন চাকরির বিনিময়ে ছেলেকে বিয়ে দিতে রাজি তখন এ চেষ্টাও তো করা যেতো।

স্যার।

নাকি স্কুল কমিটিরও গৌ-ঐ পঁচিশ হাজারই চাই?

ওরাও একটা পয়সা কম নিতে রাজি নয় নাকি?

সে তো বটেই। তবে যতদূর শুনেছি, স্কুল কমিটি স্কুলের জন্যে কোন টাকা চায় না। টাকাটা নাকি জেলা শিক্ষা অফিসের হেডক্লার্ককে দিতে হবে। সবকিছু কমপ্লিট হয়ে আছে। থানা শিক্ষা অফিসারের যা করার তা সবই তিনি করে দিয়েছেন। উপরওয়ালাদের লিষ্টে নাকি এই স্কুলের নাম আছে। এখন জেলা শিক্ষা অফিসার স্কুলটা ভিজিট করে একটা ভাল রিপোর্ট দিলেই নাকি স্কুলের মঞ্জুরিটা হয়ে যায়। উপর থেকে যা জানা গেছে, তাতে নাকি সবকিছু নির্ভর করেছে জেলা শিক্ষা অফিসারের উপর। তাই ঐ শিক্ষা অফিসারের ভিজিট আর ভাল রিপোর্টের জন্যে হেডক্লার্ক সাহেব পঁচিশ হাজার টাকা দাবি করেছেন। বলেছেন, মঞ্জুরিটা হয়ে গেলেই, সরকার থেকে গাদা-গাদা টাকা মাইনে পাবে শিক্ষকরা। এই কয়টা টাকা দেবে না? তাদের কাছ থেকে আদায় করে এনে দাও।

রেজা সাহেব নীরব হয়ে আমজাদ হোসেনের কথাগুলো শুনলেন এবং মনে মনে সতেজ হয়ে উঠলেন। আমজাদ হোসেন থামলে তিনি প্রশ্ন করলেন— হেডক্লার্ক চেয়েছেন?

: জি স্যার। সব নাকি তাঁরই হাতে। রিপোর্ট ভাল দেয়া, মন্দ দেয়া, সব নাকি তাঁর হাত দিয়েই হবে। শিক্ষা অফিসার নাকি সেরেফ একটা সই দেয়ার মালিক।

আই সি! জেলা শিক্ষা-অফিসার তা জানেন?

না স্যার। সেটা তাঁকে জানালে ঐ স্কুলের মঞ্জুরি নাকি কোনদিনই আর হবে না।

হুঁট!

সালাউদ্দীন ভাইয়ের কাছে শুনলাম, স্কুল কমিটির লোকেরা নাকি এও বলেছে যে, ঐ শিক্ষা অফিসারের রিপোর্ট যদি সালাউদ্দীন ভাই বের করে আনতে পারেন, তাহলে তাকে পঁচিশ হাজার টাকা কেন, পঁচিশটে পয়সাও স্কুলে দিতে হবে না। স্কুলের নিজস্ব ফান্ডের সাথে আগে যেসব শিক্ষক নেয়া হয়েছে, তাদের পয়সা দিয়েই ঘর-দুয়ার আর আসবাবপত্র সব হয়ে গেছে। এখন চাই ঐ রিপোর্ট। স্কুলটা ভিজিট করে শিক্ষা অফিসারের ভাল একটা রিপোর্ট। কিন্তু সালাউদ্দীন ভাইয়ের কী সাধ্য, বিনি পয়সায় ঐ রিপোর্ট বের করতে পারেন?

শুনে রেজা সাহেব নীরবে চিন্তা করলে লাগলেন। সমাধানটা তাঁর একদম নাগালের মধ্যে। কোন পথে সেই সমাধানটা করবেন, সেইটেই ভাবতে লাগলেন নীরবে।

www.boighar.com

টিফিন পিরিয়ড শেষ হয়ে গেল। ঘণ্টা পড়লো ক্লাসে যাওয়ার। আমজাদ হোসেন বললো—আমি এখন যাই স্যার?

রেজা সাহেব সরবে বাধা দিয়ে বললেন—না, দাঁড়াও। তোমাদের ঐ সালাউদ্দীন মিয়াকে কি আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে পারবে? নিজে না পারো অন্য কারো দ্বারা?

পারবো স্যার। আমি বললেই সালাউদ্দীন ভাই সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে আসবেন। কেন স্যার?

দরকার আছে। খুবই দরকার। আর সেটা তোমাদের উপকারের জন্যেই। এখনই তাকে পাঠাতে হবে। এই বেলার মধ্যেই।

এই বেলার মধ্যেই? কিন্তু ছুটিটা—

: এখন থেকেই তোমার ছুটি। তুমি বাড়ি গিয়েই ঐ সালাউদ্দীনকে এখনই পাঠিয়ে দাও। এই স্কুলে এসেই দেখা করুক আমার সাথে।

জি আচ্ছা স্যার! জি আচ্ছা।

দ্রুত উঠে দাঁড়ালো আমজাদ হোসেন। রেজা সাহেব ফের বললেন— আর শুনো, আগামীকাল তোমার বোনের বিয়েতে আমি উপস্থিত থাকতে চাই— এ কথা তোমার আশ্মাকে বলবে। আমি হাজির না হওয়া পর্যন্ত চান্দের আলীর সাথে লেন-দেন নিয়ে কোন কথাই তোমার আশ্মা যেন না বলেন। সব কথা আমি বলবো, বুঝলে?

মহাখুশি হয়ে আমজাদ হোসেন বললো আচ্ছা স্যার, আচ্ছা-আচ্ছা। আশ্মাকে তাই আমি বলবো। আপনি আমাদের বাড়িতে আসবেন শুনলে আমার আশ্মা যারপর নাই খুশি হবেন স্যার। আপনি যা বলবেন, তাই আশ্মা শুনবেন। সত্যিই আপনি আসবেন স্যার?

রেজা সাহেব জোর দিয়ে বললেন—অবশ্যই আসবো। তুমি এখনই যাও। যা বললাম তাই করোগে।

মহানন্দে আমজাদ হোসেন বাড়ির দিকে ছুটলো।

পরের দিন নির্ধারিত সময়ের কিছু আগেই বরবেশে চলে এলো চান্দেব আলী চাঁদ। বরযাত্রী হয়ে তার সঙ্গে এলো তার কয়েকজন বখাটে সঙ্গী। অর্থাৎ তারই মতো যোগানদার আর দিন মজুর। এসেই চান্দেব আলী তষিতম্বা শুরু করলো আয়োজনের নিদারুণ স্বল্পতা আর অসম্পূর্ণতা নিয়ে। তারা যে নির্ধারিত সময়ের আগেই এসে গেছে—একথা স্বরণ করিয়ে দিতে চাইতে চান্দেব আলী চড়াগলায় বলল—আগে কি রকম? আমরা তো নির্ধারিত দিনেই এসে গেছি, আগের দিন তো আসিনি। আমার মতো এমন একজন মটকা-শরেশ বর পেতে হলে আয়োজনটা যে আগের দিনই সেরে রাখতে হয়, এ জ্ঞানটাও নেই তোমাদের। এতো অন-আধুনিক তোমরা? তোমাদের সাথে যে আমার কুটুম্বিতা কেমন করে চলবে, তাই ভাবছি।

চান্দেব আলী আগেই ধরে নিয়েছিল, গরিব আর অসহায় এক বিধবার সন্তানের বিয়েতে তাদের চেয়ে উন্নত মানের লোকজন আর কে থাকবে? বিশেষ করে এই পাড়াগাঁয়ে যারা থাকবে, থানা শহর থেকে আগত চান্দেব আলীদের তুলনায় তারা নিতান্তই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যলোক বই উপরের কেউ হবে না। তাই শুরু থেকেই চান্দেব আলী নিজেদের বিরাট কিছু হিসেবে জাহির করতে লাগলো।

আয়োজনের স্বল্পতা নিয়ে চান্দেব আলীর তষিতম্বা উপস্থিত লোকজন কিছুটা থামাতেই আপ্যায়নের প্রসঙ্গ নিয়ে আবার তেঁতে উঠলো চান্দেব আলী বলতে লাগলো—এঁ্যা! সেরেফ এক গ্লাস শরবত? ফান্টা কই, কোক কই? মিঠাই-মিষ্টান্ন, আপেল-আঙ্গুর-বেদানা-কমলা, এসব কই? এসব না থাকলে কি প্রাথমিক আপ্যায়নটাকে ভদ্রোচিত বলা যায়? আমরা কি ফকিরের বাচ্চা যে টিউবওয়েলের এক গ্লাস পানি দিয়েই বিদায় করতে চান আমাদের?

বর আর বরযাত্রীদের তদবিরে আমজাদ হোসেন, সালাউদ্দীন ও পাড়ার কিছু কর্মঠ লোক ছাড়াও সালাউদ্দীনের বেশ কয়েকজন বলিষ্ঠ ও বাকপটু বন্ধুবান্ধব নিয়োজিত ছিল। তাদের একজন বললো—আরে মিয়াভাই, এসেই এত ব্যস্ত হলে কি চলে? আপেল-আঙ্গুর-কমলা-কিসমিস আনতে তো লোক পাঠানো হয়েছেই। তারা এসে পৌঁছুক, অবশ্যই সেগুলো পাবেন।

চান্দেব আলী বললো—পাবো মানে? এসব তো আগেই যোগাড় করে রাখতে হয়।

হঁ্যা, রাখতে তো হয় ঠিকই। কিন্তু আপেল-আঙ্গুর-কমলা-কিসমিস তো এ অঞ্চলে পাওয়া যায় না, অনেক দূর থেকে আনতে হয়। তাই ওগুলো যারা আনতে গেছে তাঁরা ফিরে এলেই মিঠাই মিষ্টান্ন সহকারে সব আপনাদের দেয়া

হবে।

রাবিশ! এতক্ষণও আসছে না কেন? ওসব আনতে কি তারা আফগানিস্তান গেছে?

বক্তা ব্যক্তিটি হেসে বললো—এই তো, এই তো বুঝতেই পেরেছেন। উৎকৃষ্ট মানের-আপেল-আঙ্গুর কমলা ওখানেই পাওয়া যায়। অনেক দূরের পথ, তাই আসতে একটু দেরি হচ্ছে। আপনারা ধৈর্য ধরুন, আপনাদের উপযুক্ত আপ্যায়নই করা হবে।

করা হবে মানে কি? করতেই হবে। এই যে, আমার সাথে এই যেসব বরযাত্রী দেখছেন, কেউ এরা কোন কাস্গাল-মিসকিনের সন্তান নয়। এক একজন এক একটা রাজা-জমিদারের ছেলে। আপেল-আঙ্গুর-কেক-কফি ছাড়া, এরা নাশতাই করে না কেউ?

থার্ডপণ্ডিত আমির রেজা সাহেব ইতোমধ্যেই এসে গিয়েছিলেন। এককোণে বসে তিনি বরের এইসব বাজখাঁই বক্তব্য শুনছিলেন। চান্দের আলীর এ কথার প্রেক্ষিতে সালাউদ্দীনের একজন রসিক বন্ধু বিস্ময়ের ভান করে বললেন—হায় সর্বনাশ! একদম রাজা জমিদার। এ যে গরিবের বাড়িতে হাতির পা। তো কোথাকার রাজা-জমিদার জনাব? এদেশে তো আর রাজা জমিদার নেই, এরা সব হুনুলুলু, না হস্তিনাপুরের রাজপুত্র আর জমিদারপুত্র জনাব?

বরযাত্রীরা বরের সহকর্মী। দিনমজুর আর যোগানদার মানুষ। তাদের কোন ভৌগোলিক জ্ঞান ছিল না। তিনবার এস এস সি ফেল করা চান্দের আলীরও সে জ্ঞান ছিল না। তাই এ উপহাস মাথায় তার ঢুকলো না। নিজের বাহাদুরি অক্ষুণ্ণ রাখতে তাই চান্দের আলী সঙ্গে সঙ্গে বললো— হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন। ওখানকারই-ওখানকারই। অনেক অনুরোধ বিনোরোধ করে তবেই এদের এনেছি। এইরকম বিশী আসনে বসিয়ে এদের এভাবে আপ্যায়ন করলে আমার মুখ থাকে কি করে, বলুন?

হাসি চেপে বক্তাটি ফের বললেন— কি করবো জনাব, আমাদের যে সামর্থ্য কম।

: সামর্থ্য কম তো মগডালে কণ্টা লাগিয়েছেন কেন? মারাবার পারে না, বামুন নেমতন্ন করে, হুঁঃ। আমার মতো বরের লেজে হাত দেয়ার আগে এসব কথা ভেবে দেখা উচিত ছিল আপনাদের।

সেই জন্যেই তো আমরা লেজে হাত দিয়েছি জনাব, ঘাড়ে বা গর্দানে হাত দেইনি।

কি বললেন?

www.boighar.com

বলছি, লেজ-পা এসবে হাত দিয়েই তো রাজি করেছি আপনাকে। হাতে-পায়ে না ধরলে কি আপনার মতো বর সহজে পাওয়া যায়?

ভাগ্য, ভাগ্য। আমাকে যে পেয়েছেন আর এত অল্প দামে পেয়েছেন, সেটা আপনাদের চরম সৌভাগ্য। কত তা-বড়ো তা-বড়ো লোক আমার দিকে হাত বাড়িয়ে হতাশ হয়ে ফিরে গেছে। আমাকে নাগালের মধ্যে পায়নি।

তাই কি পাওয়া যায় জনাব? চাঁদ বলে কথা। হাত বাড়ালেই কি চাঁদ হাতে পাওয়া যায়। আপনার নাম চাঁদ। নামেও চাঁদ, কামেও আপনি চাঁদের মতো দামি। আপনাকে পাওয়াটা কি চাট্টিখানি কথা?

তাহলেই বুঝুন, আপনাদের কি ভাগ্যের জোর। এরপরেই চান্দের আলী শুরু করলো, তার কাছে কতদিক থেকে কতগুলো শাদির প্রস্তাব এসেছিল তার ফিরিস্তি। টেলিভিশন, মোটরসাইকেল, মোটর গাড়ি ও কাঁড়ি-কাঁড়ি নগদ টাকার সাথে কতজন তাকে বাড়িঘর, দোকান-পাট, এমনকি মিল-ফ্যাক্টরি পর্যন্ত গড়ে দিতে চেয়েছিল তার এক নির্লজ্জ উপাখ্যান চান্দের আলী এক নাগাড়ে বয়ান করে গেল। তার বয়ান শুনে কনেপক্ষের লোকজন কপট বিশ্বাসে বললেন— বলেন কি জনাব! এতকিছু আপনাকে দিতে চেয়েছিল? আহা, সে তুলনায় আমরা কত কম দামেই না পেয়ে গেলাম আপনাকে!

কম দাম বলে কম দাম। একদম পানির দামে পেলেন। মাত্র দশ হাজার টাকা। ঘড়ি-আঙুটি-বাইসাইকেল আর একটামাত্র টেলিভিশন। এটা কি আমার মতো বরের কোন দাম নাকি? একজন মিসকিনের ছেলেকেও এত কম দামে পাওয়া যায় না।

ঠিক জনাব, ঠিক-ঠিক।

এরপর চান্দের আলী বললো—এসব কথা এখন থাক। আগে জিনিসপত্রগুলো এনে আমাদের সামনে হাজির করুন। আমরা দেখি, আপনারা আপনাদের ওয়াদা ঠিক ঠিক পূরণ করেছেন কিনা। সবার আগে টেলিভিশনটা আনুন। দেখি— কয় ইঞ্চি আর কোন কোম্পানির টেলিভিশন কিনেছেন আপনারা। কোন ফালতু মাল কিন্তু আমি নেবো না।

এবার কথা বললেন থার্ডপণ্ডিত আমির রেজা সাহেব। বললেন-টেলিভিশন দেয়ার কোন ওয়াদা তো কনেপক্ষ করেনি। এমন কোন কথাও লেনদেন চূড়ান্ত করার সময় হয়নি। এখন আবার হঠাৎ ওটা দাবি করছেন কেন?

চান্দের আলী তিরিক্বেতকণ্ঠে বললো-মতলব কি আপনাদের? হঠাৎ করে মানে? গতকালই ঘটক মারফত একথা জানিয়ে দিয়েছি কনের মাকে। হঠাৎ করে এখন দাবি করছি নাকি?

: ঐ একই কথা। গতকাল দাবি করা আর আজ দাবি করা একই কথা। টেলিভিশন কি এখানে কোথাও পাওয়া যায় যে, আপনি বললেন আর অমনি রাতারাতি টেলিভিশন এনে হাজির করা হলো?

তার মানে? মানেটা কি তার? টেলিভিশন আনা তাহলে হয়নি?

অত অল্প সময়ে কি করে আনা যাবে, একবার ভেবে দেখুন। বিরূপ দৃষ্টিতে

চেয়ে চান্দের আলী বললো, আনতে লোক পাঠানো হয়েছে তো তাহলে? নাকি তাও হয়নি?

:জি না, তাও হয়নি। লোক পাঠানো হবে কিনা, সেটা আগে বিবেচনা করে দেখতে হবে তো?

লাফিয়ে উঠলো চান্দের আলী। বললো—কি? টেলিভিশন দেয়া-না-দেয়া এখনও বিবেচনার মধ্যে? টেলিভিশন ছাড়া ঐ কয়টা টাকা আর ফালতু কয়টা জিনিস নিয়ে বিয়ে করবো আমি? আমাকে কি মনে করেন আপনারা?

এরপর সঙ্গীদের উদ্দেশ্য করে বললো—চলরে কদর আলী, মানকে, এ বিয়েই আমি করবো না—চল। ওঠ ওঠ- উঠে পড় সবাই।

দশ হাজার টাকা আর ঘড়ি-আঙুটি-বাইসাইকেল চান্দের আলীর মতো একজন বরের অনেক পাওনা। এটা বুঝতে পেরে তার সঙ্গীরা তাকে টেনে বসাতে বসাতে বললো— আরে বসো বসো। এত খেপলে কি চলে? দেখি টেলিভিশন সম্বন্ধে ইনারা শেষমেষ কি বলেন, দেখি।

রেজা সাহেব বললেন—কি আর বলবো? টেলিভিশন আদৌ দিলে আমরা সেটা পরে দেবো। এখন দেয়া যাবে না।

আবার গর্জে উঠে চান্দের আলী বললো— পরে দেবো মানে? বিয়ে দেবেন এখন আর টেলিভিশন দেবেন পরে-এর অর্থটা কি?

অর্থটা হচ্ছে-আপনার নিজের কোন বাড়িঘর নেই। টেলিভিশন নিয়ে গিয়ে রাখবেন কোথায়?

বাড়ি ঘর নেই। মানে? আমি কি গাছে থাকি?

তাই থাকলেই মানাতো।

কি বললেন?

: না বলছি, গাছে না থাকলেও পরের বাড়িতে থাকেন। নিজের কোন বাড়িঘর নেই। নিজের বাড়িঘর আগে হোক।

হোক কেমন? হতে আর কতক্ষণ? আমি একজন রাজমিস্ত্রী তা জানেন? মানে রাজমিস্ত্রীর যোগানদার। রড-সিমেন্ট-ইট-বালি সব আমার হাতে। ওখান থেকে যদি দৈনিক কিছুটা করে সরাতে থাকি, তাহলে ঘরবাড়ি হতে আমার মোটেই কিছু সময় লাগবে নাকি?

তাই? বাহ! আপনাকে তো বেশ করিকর্মা লোক বলে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ এমনটি যদি করতে পারেন, তাহলে আর সময় লাগার ঠিকই কথা নয়। কিন্তু জনাব, শুধু মাল-মসলা থাকলেই তো হবে না। ঘর-দুয়ার শূন্যের উপর হয় না। ঘর-দুয়ার করার আগে জায়গা-জমি কেনা চাই। কিন্তু সে পয়সা তো নেই আপনার। জায়গা কিনবেন কি দিয়ে?

চান্দের আলী এবার দরাজকণ্ঠে বললো—কি দিয়ে কি বলছেন? আমার কি

টাকার অভাব? বলতে পারেন, একদম টাকার বস্তার উপর বসে আছি আমি।

সেকি! করেন তো রাজমিস্ত্রীর পেছনে যোগানদারের কাজ। ওতে কয় পয়সা মজুরি পান দৈনিক যে, টাকায় ভরে যাবে বস্তা আপনার?

চান্দের আলী বললো— আরে বলে কি? আমার কি উপায়ের ঘাট-ঐ একটা? দশদিক থেকে দুই হাতে উপায় করি আমি তা কি জানেন?

বিশ্বয়ের ভান করে রেজা সাহেব বললেন— নাতো! জানিনে তো! সেই ঘাটগুলো তাহলে কি?

প্রথম দফায় দেখুন-এই যে এত জনসভা আর মিটিং-মিছিল হয়, একা একা তো হয় না। শ'য়ে শ'য়ে হাজারে হাজার মানুষ নিয়ে হয়। এসব মানুষ কীভাবে আসে?

কীভাবে আবার। কেউ পায়ে হেঁটে আসে, কেউ আসে যানবাহনে চড়ে।

হলো না। কেন তারা আসে?

নেতাদের ডাকে আসে।

তাও হলো না।

তাও হলো না! তাহলে নেতাদের প্রেমে তারা আসে।

আরে দূর। আপনি কিছুই বোঝেন না দেখছি। ভাল নেতা অবশ্যই কিছু আছে। দেশটা যখন কোন মতে চলছে, আটকে যায়নি, তখন ভাল নেতা যে দেশে নেই, এটা বলা যাবে না। কিন্তু তাঁরা কয়জন? নখে গনা কয়েকজন। বাদবাকি সব ধোঁকাবাজ আর দুর্নীতিবাজ নেতা। যে যত বেশি দুর্নীতিবাজ, তার তত বেশি নাম ডাক।

আরে— আরে! আপনার মুখে এসব কথা!

চমকে উঠে চান্দের আলী বললো— আমার কথা হবে কেন? এসব কি আমার কথা? এসবের আমি কি বুঝি? খামাখা এসব বলে কি আমি ফ্যাসাদে পড়বো? আমার শোনা কথাটা চালিয়ে দিচ্ছি এখানে।

তাই বলুন। তা অধিকাংশ নেতাই ধোঁকাবাজ না কি বলছিলেন?

আমি যা বলছিলাম তা হলো, পাবলিককে ধোঁকা দেয়াই ঐ বাদবাকি নেতাদের কাজ। এদের প্রেমে পড়ে মিছিল, সভা আর মিটিং-এ মানুষ আসবে মানে? পাগল- ছাগল ছাড়া ঐ ধোঁকাবাজদের প্রেমে কি ভাল মানুষ কখনো পড়ে?

পড়ে না?

: না। মুখে প্রেম-প্রেম ভাব দেখায় শুধু। ভেতরে প্রেমের 'প'ও থাকে না। আমিও তাদের সাথে ঐ রকম করি। কিন্তু প্রেমে পড়ে নয়।

: বলেন কি! তাহলে তাদের সভা-মিছিলে লোক আসে কেন? মানে ঐ হাজার হাজার মানুষ!

টাকার প্রেমে আসে। নেতাদের কিছু চেলা-চামচে ছাড়া বাদবাকি সবাই আসে টাকার প্রেমে, বুঝলেন। তংকা।

চান্দেব আলী আঙুলে টাকা বাজানোর ভাব করলো। রেজা সাহেব বললেন—তংকা?

হ্যাঁ, সেরেফ তংকা। মাথাপিছু দশ, পনের, এমনকি পরিস্থিতি অনুপাতে বিশ টাকা দেয়ারও চুক্তি করা হয়। ঐ টাকার লোভে ঐসব মানুষ সভা-মিছিলে আসে।

ও আচ্ছা। তা এতে আপনার লাভ?

বিরাট লাভ— মোটা লাভ। শুধু টাকা দেয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করলেই তো মানুষ পাওয়া যায় না। মানুষ জুটিয়ে দিতে হয়। আর সেই জুটিয়ে দেয় কে? এই শর্মা। আমি আর আমার মতো কিছু ষাড়মার্কা লোক। গুঁতিয়ে যারা লোক জোটাতে পারে, তারা। এই লোক জুটিয়ে দেয়ার জন্যে আমাদেরও দেয়া হয় লোকপ্রতি দুই টাকা। যতলোক জুটিয়ে দেবো তত দুই টাকা কুলি-কামিন, ফকির-মিসকিন, ছাত্র-ফাত্র দিয়ে যদি পাঁচশ মানুষ আমি জুটিয়ে দিতে পারি, তাহলে আমার পাওনা হচ্ছে কত, এবার হিসেব করুন।

ওরে বাবা! এতো অনেক টাকা!

হ্যাঁ, অনেক টাকা। হাজার টাকা এক দানে। সব সময় এসব দাও না এলেও, মাঝে মাঝেই আসে। যখন আসে তখন এক দানে হাজার টাকা। এবার দেখুন, টাকার কি অভাব আছে আমার?

www.boighar.com

না-না, এমন দান ঘন ঘন মারতে পারলে, টাকার আর অভাব কী!

শুধু এই একটা ঘাটই নয়। এর চেয়েও আরো বড় ঘাট আছে। এই তো সামনেই ইলেকশন। ভাল মানুষকে তো ভোট দেয় না মানুষ। ভোট দেয় দুর্নীতিবাজ টাকাওয়ালাদের দেখে। তাই টাকার বস্তা পিঠে নিয়ে ইলেকশনে নামে এই ক্যান্ডিডেটরা। যদি একটা মালদার ক্যান্ডিডেটের ক্যানভাসার হতে পারি আর ভোটারদের মধ্যে টাকা বিতরণ করার কাজটা পাই তাহলে ঐ বস্তাভরা টাকার অর্ধেকটা মেঝে দেয়া কি এমন কোন কঠিন কাজ? ভোটার প্রতি দশ টাকা দিয়ে বিশ টাকা দেয়ার হিসেব যদি দিই, তাহলে আমার পকেটে এলো কত, ভেবে দেখুন।

ভাববো কি? তখন তো আপনার পকেটে কুলোবে না। আর একটা বস্তা লাগবে।

ব্যাপারটা ঐ রকমই আর কি।

সাক্ষাস।

এতেই পুলকিত হচ্ছেন? এর পাশে ছুটছাট আরো কত ঘাট আছে, তা তো বলিইনি।

যথা?

মিথ্যা মামলায় কতজনের সাক্ষীর দরকার পড়ে, সেই সাক্ষী হলে বা মিথ্যা সাক্ষী যোগাড় করে দিলে, জমিজমা কেনা কাটায় দালালি করলে, যানবাহনের জন্যে যাত্রী ডেকে দিলে, যাত্রা-সিনেমা-সার্কাসের মাইকিং করলে— মানে ঘাটের কি শেষ আছে পয়সা উপার্জন করার? চুরি-ডাকাতি না করলেও ভূরি-ভূরি টাকা উপায় করা যায়। চুরি ডাকাতিতে অংশ নিলে তো আরো অনেক টাকা, বুঝেছেন?

বুঝেছি-বুঝেছি। ওরে বাপরে! আপনি শুধু করিৎকর্মাই নন, বিশ্বকর্মার বাবা। আপনার মতো মানুষকে এ মর্তে মানায় না।

কি রকম?

: নামেও আপনি চাঁদ, আসলেও আপনি চাঁদ। চাঁদের টুকরো নয়, একদম গোটা একখানা চাঁদ। একমাত্র আসমানেই আপনাকে মানায়। আসমান থেকে টপকে কেন যে আপনি এই মাটির পৃথিবীতে এলেন, সেইটেই কেবল ভাবছি।

এদের এই দীর্ঘ আলাপে বরের সঙ্গীরা অস্থির হয়ে উঠলো। তারা বরকে বললো— আরে রাখো তো এসব আলাপ। ক্ষুধায় পেট আমাদের জ্বলে যাচ্ছে। যা বুঝা যাচ্ছে, কলেমা পড়ানোর আগে খেতে এরা দেবে না। কলেমাটা জলদি জলদি সেরে ফেলার ব্যবস্থা করো তো।

খেয়াল হতেই বর বললো— হ্যাঁ-হ্যাঁ, আসল কথায় আসি। তাহলে টেলিভিশনটা আপনারা পরে দেবেন— এই তো?

রেজা সাহেব বললেন-হ্যাঁ, সেই রকমই ভাবছি। চান্দ্রের আলী বলল বেশ তাহলে ঘড়ি-আঙুটি-সাইকেলটা আনুন। সন্ধ্যা হয়ে এলো, শাদিটা তো সারতে হবে তাড়াতাড়ি।

হ্যাঁ, তা তো হবে। তবে ঘড়ি-আঙুটি-সাইকেলও পরে দিতে চাচ্ছি আমরা। কেন, পরে কেন?

: আপনি পরের বাড়ির এক বাইরের ঘরে থাকেন। শুনলাম, ঘরের বেড়া-টাটি, দরজা-জানালা-সবই নড়বড়ে। ঐ ঘরে এই সব জিনিস রাখলে যে কোন দিন চুরি হয়ে যাবে সব। কাজেই পাকা ঘর-দোর আগে করুন, পরে এসব দেব।

সেকি! এগুলোও যদি না দেন, তাহলে আমি বিয়ে করবো কেন?

: না করলে তো আমাদের কিছু করার নেই। চোরকে খাওয়ানোর জন্যে এসব জিনিস আপনারা হাতে দিতে পারিনে আমরা।

ফের উত্তেজিত হয়ে উঠলো চান্দ্রের আলী।

সঙ্গীদের উদ্দেশ্য করে বললো— বটে। চলরে ফেলু, চলরে কান্দুরা, শুটকা, কদর আলী, এ বিয়েই আমি করবো না, চল। এখনই সবাই আমরা বাড়ি চলে

যাই—

কিন্তু তার সঙ্গীরা তার কথায় সায় দিতে পারলো না। তাকে টেনে নিয়ে আলোচনায় বসলো তারা। চান্দ্রের আলীর কানে কানে সবাই তারা বললো—আরে বেয়াকুফ! পরে যখন দিতে চাচ্ছে, তখন এমন দাঁও ফেলে যাচ্ছিস কোন বুদ্ধিতে। অন্য জায়গায় বিয়ে করতে চাইলে এর অর্ধেকটাও কেউ তোকে দেবে নাকি? অনেকই তো চেষ্টা করে দেখলি।

চান্দ্রের আলীও তাদের কানে কানে বললো, তাহলে কি করতে বলিস তোরা?

সঙ্গীরা বললো—ওরা গর্ভভ, নগদ দশ হাজার টাকা—একি কম কথা? ঐ টাকাটা নিয়েই বিয়ে করে ফ্যাল। পরে বউয়ের পিঠে কিল ফেললে, অন্য সব কিছু এরা বাপ বাপ করে পৌঁছে দেবে বাড়িতে।

হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাইতো রে। ঠিক আছে, তাহলে তাই করি।

যুক্তি-বুদ্ধি এঁটে নিয়ে চান্দ্রের আলী বললো—আচ্ছা ঠিক আছে। আপনারা যখন পরে দিতে চাচ্ছেন, তাই সই। ঐ নগদ দশ হাজার টাকাটা আনুন। ওটা পেলেই বিয়েটা করে ফেলি।

রেজা সাহেব ভিন্ন সুরে বললেন—তওবা, তওবা। কি যে মসকরা করেন জনাব! আপনি যে ফিরিস্তি দিলেন, তাতে তো আপনি লাখ লাখ টাকার মানুষ। গরিব বিধবার ঐ সামান্য দশ হাজার টাকা নিয়ে আপনি করবেন কি? এতে তো নিদারুণ বদনাম হবে আপনার। টাকার ও দাবি আপনি ছেড়ে দিন।

আবার লাফিয়ে উঠলো চান্দ্রের আলী। বললো কি? কি বললেন? তাহলে খালি হাতে বিয়ে করবো নাকি?

: না করেন চলে যান। সামান্য ঐ দশ হাজার টাকা দিয়ে আপনার মতো মামী লোকের মান মারতে পারিনে আমরা।

গুরুগম্ভীরকণ্ঠে এবার চান্দ্রের আলী বললো তার মানে? এর মানেটা কি? আপনারা কি তামাসা করছেন আমাদের সাথে? এতক্ষণ বসিয়ে রেখে এখন বলছেন চলে যান! এতটা অভদ্র আপনারা? সবাই আমরা ক্ষুধায় জন্ঝোর কষ্ট পাচ্ছি, খাবার দেয়ার কোন ব্যবস্থাও করলেন না, কি পেয়েছেন আপনারা এতগুলো লোককে অনাহারে রেখে

কি করবো বলুন। পাক এখনও চড়ানোই হয়নি। হা করে সবাই আপনার লাখ লাখ টাকার গল্প শুনেছে। পাকশাকের দিকে কেউই যায় নি। খেতে দেবো কোথেকে? বাড়িতে গিয়েই আপনারা খেয়ে নিনগে, যান।

তব্বেরে! ডেকে এনে অপমান? বিয়ে আপনারা দেবেন না। রেজা সাহেবও গম্ভীরকণ্ঠে বললেন—না। আপনার মতো এতবড় গুণধর পাত্র আমরা হজম করতে পারবো না। আপনারা আপুছে আপু কেটে পড়ুন।

চান্দের আলী হাত-পা ছুড়তে লাগলো। সঙ্গীদের উদ্দেশ্য করে বললো-
কিরে দেখাছিস কি তোরা? এতবড় অপমান নীরবে সহ্য করবি সবাই?

সঙ্গীরা সবাই এক সাথে বললো-অসম্ভব। কি করবো তাই বল?

কি করবি মানে? আমরা এতগুলো লোক আছি। অম্নি অম্নি কি ফিরে
যাবো আমরা? চল, কনেকে আমরা জোর করে তুলে নিয়ে যাই চল। বিয়ে
করতে এসে অপমান হয়ে ফিরে যাবো?

সবাই আবার এক সাথে বললো-ঠিক ঠিক। তাই করি চল। কনেকে লুট করে
নিয়ে যাই। বিয়ে দেবে না মানে? ব্যাটারা ঘুঘু দেখেছে, ফাঁদ দেখেনি। চল দেখি
ঠেকায় কে?

তৎক্ষণাৎ তারা সবাই হৈ হৈ করে বাড়ির ভেতরে যেতে লাগলো। এজন্যে
তৈয়ার ছিলেন রেজা সাহেবরা। অনেক লোক আগে থেকেই যোগাড় করে রাখা
ছিল। বরপক্ষ বাড়ির উপর চড়াও হতে যেতেই মার মার রবে ছুটে এসে
কনেপক্ষের সেই লোকেরা চারদিক থেকে ঘিরে ধরলো বর ও তার সঙ্গীদের।
ঘিরে ধরে তাদের পিঠে এলোপাতাড়ি লাঠি হাঁকাতে লাগলো। লাঠির ঘায়ে
দিশেহারা হয়ে বর ও তার সঙ্গীরা মুহূর্তেই রণেভঙ্গ দিলো। “ওরে বাবারে,
মলেমরে” রবে আর্তনাদ করতে করতে তারা যে যেদিক দিয়ে পারলো, প্রাণ
নিয়ে পালিয়ে গেল।

আপদ বিদেয় হওয়ার পর রেজা সাহেব সালাউদ্দীনকে ডেকে বললেন, স্কুল
কমিটির সাথে কথাবার্তা পাকা করে নিয়েছো তো?

সালাউদ্দীন আহমেদ খুশির সাথে বললো, জি স্যার একদম পাকা। জেলা
শিক্ষা অফিসারের দ্বারা ভিজিটটা করিয়ে নিয়ে ভাল একটা রিপোর্ট দেয়াতে
পারলে সংগে সংগে স্কুলে আমাকে নিয়ে নেবেন তাঁরা। চাকরি আমার বান্ধা।

ঠিক তো।

একদম ঠিক। তাঁরা বলেছেন, কথার তাঁদের একবিন্দুও নড়চড় হবে না।

বেশ, তাহলে আগামীকালই আমার সাথে চলো। কয়েকদিনের জন্যে
ঢাকায় যাচ্ছি আমি। ঐ যাওয়ার পথেই জেলা শিক্ষা- অফিসারের সাথে
তোমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে যাবো আর যা করার তা করার জন্যে বলে যাবো
তঁাকে। তিনি আমার অত্যন্ত প্রিয়জন। আমি বললে তিনি জলদি জলদি করে
দেবেন সবকিছু। মোটেই সময় নেবেন না।

স্যার।

তিনি কোনদিন ভিজিটে আসতে পারবেন, সেকথা তখনই জানিয়ে দেবেন
তোমাকে। সেই মোতাবেক তুমি আবার গিয়ে তঁাকে পথ দেখিয়ে স্কুলে নিয়ে
আসবেমাত্র। ব্যস। তোমার কাজ শেষ। এরপর সবকিছু ঠিক ঠিক হয়ে যাবে
ইনশাআল্লাহ।

সালাউদ্দীন আপুতকণ্ঠে বললো—আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ স্যার। আপনার এ উপকার আমি জীবনেও ভুলবো না।

তা বেশ। কিন্তু চাকরিটা হয়ে গেলে সালেহাকে শাদি করতে আবার ভুলে যেও না যেন?

না স্যার, কখখনো না। সালেহাকে পাওয়ার জন্যে কেঁদে ফিরছি আমি। তাকে শাদি করতে ভুলে যাবো স্যার? এমন ভুলে যাওয়ার আগে যেন আমার মৃত্যু হয়।

রেজা সাহেব হেসে বললেন—থাক-থাক, আর বলতে হবে না। তাহলে আগামীকাল রেডি হয়ে আমার স্কুলে চলে আসো। প্রথম পিরিয়ডটা করে স্কুল থেকেই রওনা হবো আমি।

www.boighar.com

ঠিক আছে স্যার- ঠিক আছে। আমি যথা সময়ে এসে পড়বো ঠিক ঠিক।

অতঃপর রেজা সাহেব আমজাদ হোসেনের আম্মাকে ডেকে বললেন—আমজাদ হোসেনের মুখে নিশ্চয়ই আপনি সব শুনেছেন। মেয়ের শাদি নিয়ে মোটেই আর ভাববেন না আপনি। আপনার মেয়ের বিয়ের দায়িত্ব এখন আমার। বিনে খরচে আপনাদের পছন্দ করা বরটাই পেয়ে যাবেন আপনারা।

কৃতজ্ঞতায় বিহ্বল আমজাদ হোসেনের আম্মা আকুলকণ্ঠে বললেন—আল্লাহতায়াল্লা আপনার অশেষ ভালাই করুন বাপজান। আমাদের জন্যে আপনি আল্লাহতায়ালার এক রহমত।

পরের দিন যথাসময়ে সালাউদ্দীনকে সাথে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন আমির রেজা সাহেব। অপরদিকে সেইদিনই দুপুরের মধ্যে সারা গাঁ রটে গেল, থার্ডপণ্ডিত রেজা সাহেব আর একটা বিয়ে ভেঙে দিয়েছেন গতকাল। পণ্ডিত রেখে তিনি এখন এই করেই বেড়াচ্ছেন। বিয়ের আসর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন বর আর বর যাত্রীদের। গরিব বিধবা অতি অল্প খরচেই মেয়ের বিয়ে দিয়ে ফেলছিল, সেই সময় ঐ পণ্ডিত গিয়ে গোলমাল পাকিয়ে ভেঙে দিয়েছেন ঐ বিয়ে। এতে করে মেয়েটার ভবিষ্যৎ তিনি অন্ধকার করে দিয়েছেন আর চরম বিপাকে ফেলেছেন ঐ গরিব বিধবাকে। এরপর মেয়েটার শাদিও দেয়া আর তার সম্ভবপরই হবে না হয়তো।

রটনাটা ছড়িয়ে পড়লো সর্বত্র। ওটা যথাসময়ে চলে এলো নূরীদের বাড়িতেও। চান্দের আলীর এক দূর-সম্পর্কের আত্মীয় ছিল এই গাঁয়ে। নূরীদের বাড়িতে এসে সকলের সামনে সে ঘটনা করে জানালো, “ঐ পাড়ার আমজাদ হোসেনের সুন্দরী বোন সালেহাকে দেখে বিগড়ে গেছে এখানকার স্কুলের থার্ডপণ্ডিতের মাথা। ঐ সালেহাকে নিজে বিয়ে করার নাম-করে গতকাল সে সালেহার বিয়েটা ভেঙে দিয়ে এসেছে। বিয়ে তো সে করবে না, তা জানি। মেয়েটার সর্বনাশ করার জন্যেই এই অঘটন ঘট হয়েছে। এমন চরিত্রের একটা পণ্ডিতকে কেন যে রাখা হয়েছে স্কুলে, তা আমার মাথায় ধরে না”।

ভেতরের উদ্দেশ্যটা যা-ই হোক, সালেহার বিয়েটা যে রেজা সাহেব ভেঙে দিয়ে এসেছেন—এ খবর নূরী ও তার আব্বাজান-মামুজানসহ এ বাড়ির সকলেই নিশ্চিতভাবে জানতে পারলেন। নানা জনের মাধ্যমে এ খবরই ঐদিনই একের পর এক এসে তাঁদের কানে পড়লো। ঘটনাটা জেনে এ বাড়ির একেক জন একেক রকম মন্তব্য করতে লাগলেন। নূরীর চোখ-মুখ একদম বিকৃত হয়ে গেল। সালেহাকে সে চেনে। সালেহাও যে দেখতে খুবই সুন্দরী— নূরী তা জানে। তাই বিকৃত হলো মুখ তার। ক্ষোভে-দুঃখে নূরী বিড় বিড় করে বলতে লাগলো — শেষ পর্যন্ত সালেহার উপর নজর পড়লো পণ্ডিতের! ছিঃ। এত জঘণ্য লোক সে!

৮

পাঁচ-ছয় দিনের মধ্যেই ঢাকা থেকে ফিরে এলেন আহমদ আমির রেজা। এরপর মিশ্র প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে দিন কাটতে লাগলো তার। নিদারুণ দুর্নাম আর বিপুল প্রশংসা একসাথে আর পাশাপাশি চলতে লাগলো তাঁকে ঘিরে। কিন্তু রেজা সাহেব সর্বাবস্থাতেই অবিচল রয়ে গেলেন। দুর্নামে ভেঙ্গে পড়া বা প্রশংসায় ফুলে ওঠা এর কোনটার কোন আলামতই তার মধ্যে প্রতিফলিত হলো না। অবিচলভাবে তিনি তাঁর নিজ অক্ষপথে বিচরণ করতে লাগলেন। স্কুল থাকলে স্কুল করেন, স্কুল না থাকলে অল্পসময় এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়ান আর অধিক সময় ঘরের মধ্যে নিজেই নিজেকে আবদ্ধ করে ফেলেন। কারো কাছে বেশি তিনি যান না, তাঁর কাছেও কেউ তেমন আসে না। অখণ্ড অবসর ও নিঃস্বপ্ন নিরিবিলা। এই অবসর আর নিরিবিলা তাঁর খুশির বই অখুশির কোন কারণ হয়ে দাঁড়ায় না। বই-পুস্তক আর খাতা-কলম নিয়ে ধুমছে তিনি এই অবসরের সন্ধ্যাবহার করেন। নির্জন এক দ্বীপের নিঃসঙ্গ মানুষ হিসাবে দিন কেটে যায় তাঁর। আজকাল তাঁর খোঁজ-খবর এ বাড়িরও কেউ তেমন নেন না। বিরূপভাবে খুব একটা না দেখলেও, খুশি হয়ে তাঁর কাছে ছুটেও কেউ আসেন না। নূরী এখন অন্তরাল থেকেই তাঁর খোঁজ-খবর নেয়, তাঁর কাছে আর আগের মতো আসে না। কাছে আসার লোক বলতে রেজা সাহেবের একমাত্র সোহাগী— এই সোহাগীই এখন তার সব খোঁজ খবর নেয়, খাবার-দাবার জোগান দেয়। চিররুগ্না নূরীর আশ্রয় আশ্রিয়া বেগম এ সংসারে একজন উহ্যব্যক্তি। সংসারটা মোটের উপর ঝি-চাকরানীর উপরই নির্ভরশীল। এই ঝি-চাকরানীর মধ্যে একমাত্র এই সোহাগীই অষ্টপ্রহর রেজা সাহেবের তত্ত্বাবধানে আছে। বলাবাহুল্য, অন্তরালের নূরীই সোহাগীর এ কাজের মূল চালিকাশক্তি।

রেজা সাহেবের এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটলো প্রায় মাসখানেক পরে। আর তিন দিন পরেই পবিত্র রমজান মাসের শুরু। শুরু হবে রমজানের রোজা। আজই রমজানের আগের শেষ জুমআ। জুমার নামাজ আদায় করতে মুসল্লীরা এসে হাজির হলেন মসজিদে। কিন্তু ইমাম সাহেব এলেন না। ইমাম সাহেবের

ভিন্নগাঁয়ে বাড়ি। ইমাম সাহেবের জন্যে অপেক্ষা করে থেকে থেকে সুন্নত নামাজ, অর্থাৎ কাবলাল জুমা পড়ে নিলেন সবাই। তবুও ইমাম সাহেব এলেন না। উল্টো এই সময়ই খবর এলো— হঠাৎ করে স্ট্রোক করায় গতকাল ইমাম সাহেবকে জেলা সদরে নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আজ সকাল পর্যন্ত তাঁর জ্ঞান ফিরে আসেনি। জ্ঞান ফিরে এলেও মাসাধিককাল পর্যন্ত আর তাঁর উত্থান শক্তি থাকবে না।

খবর শুনে মুসল্লীরা মর্মান্বিত হওয়ার সাথে মহামুসিবতে পড়ে গেলেন। গাঁয়ের মানুষ তাঁরা। কারো বেশি লেখাপড়া নেই। ইসলামী লেখাপড়া জানা লোক আরো কম। হাতেম মিয়া আর আব্দুল জব্বার সাহেব ইসলামী লেখাপড়া কিছুটা জানেন। ইমাম সাহেবের অনুপস্থিতিতে ঠেকা কাজ কোনমতে তাঁরাই চালান। এই দুইজনই জুমায় আজ অনুপস্থিত। দূরে কোথায় এক শাদির দাওয়াতে গেছেন তাঁরা। এখন ইমামতি করেন কে, বিশেষ করে খোতবা পাঠ উপস্থিত মুসল্লীদের মধ্যে কার দ্বারা সম্ভব-এ নিয়ে মুসল্লীরা ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেলেন। দু'চারজন যাকেই জিজ্ঞাসা করা হলো তিনিই তার অক্ষমতা জ্ঞাপন করলেন সঙ্গে সঙ্গে।

মুসল্লীদের মধ্যে স্থানীয় হাইস্কুলের কয়েকজন ছাত্রও ছিল। তাদের একজন এই সময় বলে উঠলো— এ নিয়ে এতো ভাবছেন কেন আপনারা? আমাদের ঐ স্যারকে বলুন না? তিনি অনায়াসেই এ কাজ করে দিতে পারবেন।

এ কথায় জনৈক মুসল্লী প্রশ্ন করলেন— স্যার মানে? কোন স্যার?

রেজা সাহেবের প্রতি ইংগিত করে ছেলেটি বললো— আমাদের ঐ থার্ডপণ্ডিত স্যার। একাজে উনি খুব দক্ষলোক।

অন্য এক মুসল্লী অবজ্ঞাভরে বললেন— বটে! উনি।

ছেলেটি বললো— হ্যাঁ, উনার কথাই বলছি।

গাঁয়ের অন্যতম প্রধান ঐ করিম বক্শো সাহেবও এসেছিলেন। একথা শুনে তিনি রুষ্টকণ্ঠে বললেন— আরে থামো! যার জাতপাতেরই ঠিক নেই, হিন্দু না মুসলামান— আজও যা পুরোপুরি পরিষ্কার হলো না, সে পড়াবে জুমার নামাজ, হুঁ। সে জ্ঞান কি আছে তার?

অন্য এক ছাত্র সরবে বললো— আছে-আছে। আমাদের স্কুলের জামাতে এই স্যারই তো প্রায়দিন ইমামতি করেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন স্যার। সে জ্ঞান নেই মানে? তার চেহারাটা দেখলেও তো সেটা বোঝা যায়।

আবার ধমকে উঠলেন বক্শো সাহেব। বললেন— ফের কথা! পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ তো অনেকেই পড়ি আমরা।

ছোটখাটো জামাতে আমরাও ইমামতি করি। সেই ইমামতি আর জুমার নামাজের ইমামতি কি এক কথা? এর উপর আছে খোতবা পাঠ। যত্নসব।

শহর থেকে আসা এক আধুনিক শিক্ষিত যুবকও ঘটনাচক্রে মসজিদে এসেছিল। বকশো সাহেব থামতেই হাইস্কুলের এই ছাত্রটিকে কটাক্ষ করে সে বলে উঠলো— ঐ যে ঠাকুরের ঐ কবিতা— “ওরা আছে সমাজের কোন তলায়, বামুন হয়ে কি পৈতে দিলেই গলায়” সেই কথারই হাল হলো যে ব্রাদার। দু’এক টিপ নামাজ পড়লেই আর দাড়ি রাখলেই ইমাম হওয়া যায় না, বুঝলে?

স্বল্পবুদ্ধির কিছু লোক হেসে উঠলো এ কথায়।

নূরীর মামা মৃধা সাহেব ধমক দিয়ে বললেন— থামুন! মসজিদ হাসাহাসি আর ইয়ার্কি ঠাট্টার জায়গা নয়।

এরপরে তিনি রেজা সাহেবকে উদ্দেশ্য করে বললেন— কি পণ্ডিত, পারবে কি পারবে না— সে কথাটা সাফ সাফ বলে দিলেই তো পারো। এত কথা হয় না খামাখা?

যারাই রেজা সাহেবের সান্নিধ্যে থেকেছেন, তারাই রেজা সাহেবের এদিকটার উপর যথেষ্ট আস্থাবান ছিলেন। মৃধা সাহেবও ঐ আস্থার উপর ভিত্তি করে রেজা সাহেবকে এই তাকিদটা দিলেন। মৃধা সাহেবের কথার জবাবে রেজা সাহেব স্মিতহাস্যে বললেন— বলবো কি? বলার আগেই তো সবাই আমার উপর গভীর অনাস্থা প্রকাশ করছেন। আমার দ্বারা একাজ হবে না— এটা আগেই যখন ধরে নিচ্ছেন তারা, তখন আর কেন উপযাচক হয়ে কথা বলতে যাবো আমি?

এ কথায় অনেকে আশান্বিত হয়ে উঠলেন। বললেন— ঐ্যা, আপনি কি তাহলে পারবেন? আপনার কথার ধরনে তো সেই রকমই মনে হচ্ছে।

রেজা সাহেব বললেন— লোক যদি আর কাউকে একান্তই না পাওয়া যায়, তাহলে চেষ্টা করে দেখতে পারি আমি।

চেষ্টা করে দেখতে পারি মানে?

মানে, কাজটা চালিয়ে দিতে পারি—এই আরকি!

খোত্বা পড়তে পারবেন?

তা পারবো ইনশাআল্লাহ।

অধিকাংশ মুসল্লীই এবার উৎফুল্লকণ্ঠে বলে উঠলেন— তাহলে আর দেরি করবেন না পণ্ডিত সাহেব। সময় চলে যাচ্ছে। সুনুত পড়া হয়ে গেছে সবার। রমজানের রোজার ফজিলতের উপর দু’কথা বলে খোত্বা পাঠ শুরু করুন।

উঠে দাঁড়ালেন রেজা সাহেব মিস্বরে গিয়ে দাঁড়িয়ে সবাইকে সালাম জানালেন আগে। তার পরে শুরু করলেন বক্তৃতা। রমজান মাস আর রমজানের রোজার ফজিলত নিয়ে সুলোলিতকণ্ঠে এমন হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিলেন যে, মসজিদ ভরা মুসল্লী সকলেই মোহিত হয়ে গেলেন। এমন জ্ঞানগর্ভ আর তথ্যভিত্তিক বক্তৃতা এর আগে এ মসজিদে আর কখনই তারা শুনেনি। এছাড়া, রেজা সাহেবের নূরানী চেহারা আর অনন্য বাচনভঙ্গিও মুগ্ধ করলো সবাইকে।

যে চেহারাটা এতদিন কাছে থেকেও লক্ষ্য করেননি তারা, আজ এই বিশেষ পরিবেশে রেজা সাহেবের সেই চেহারাটা জীবন্ত হয়ে ধরা দিলো সবার চোখে।

অলক্ষণ বক্তৃতা করে থামতেই সবাই একবাক্যে বলে উঠলেন থামলেন কেন, থামলেন কেন? আরো কিছুক্ষণ বলুন জনাব। বড়ই অপূর্ব লাগছে। মনে খুবই দাগ কাটছে। আর একটু বলুন শুন।

হাতঘড়ি বাড়িয়ে ধরে রেজা সাহেব বললেন—জুমার নামাজের সময় পার হয়ে যাচ্ছে ভাইসব। আর বক্তৃতা করা যাবে না। আল্লাহ চাহেন তো আগামী জুমায় আবার কিছু বলার চেষ্টা করবো। এখন খোতবাটা শেষ করা দরকার।

হুঁশে এলেন সবাই। আজানের পর রেজা সাহেব যখন খোত্বা পাঠ শুরু করলেন, তখন আর একবার স্তম্ভিত হলেন সবাই। কি চমৎকার উচ্চারণভঙ্গি আর কি স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ পঠন। এমন সুন্দর আর ঝরঝরেভাবে আরবী ভাষা পড়তে পারেন বাংলা ব্যাকরণের এই থার্ডপণ্ডিত এটা কারো কল্পনাতেও ছিল না। সরবে তারিফ করার সুযোগ তখন না থাকায়, মুসল্লীরা সবাই কোন মতে এ বিস্ময় নীরবে চেপে যেতে লাগলেন।

এরপর রেজা সাহেবের ইমামতিতে জুমার ফরজ নামাজ আদায় করলেন সবাই। পরে পরেই আদায় করলেন বাদ বাঁকি নামাজ। সমুদয় নামাজ আদায় করা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই সবাই আবার রেজা সাহেবের তারিফে মুখর হয়ে উঠলেন। এই তারিফের মাঝে কেউ কেউ এ কথাও বললেন যে, সত্য মিথ্যা যা-ই হোক। তারা কেবল পণ্ডিতের বদনামের কথাটাই শুনেছেন, এতবড় একটা গুণের কথা কেউ তারা জানতেন না। এগুণ শুধু গুণই নয়, মহাগুণ। এমন গুণে গুণবান যে ব্যক্তি, তার ঐসব বদনামের কথা কানে তোলাও পাপ। বিশ্বাস করতে চাওয়াটা আরো মস্তবড় গুনাহ। অন্তত এটাই তাদের মনে হচ্ছে এখন।

ভিন গাঁয়ের এক আলেম কার্যোপলক্ষে এদিকে এসেছিলেন। জুমার নামাজ যায় যায় দেখে জুমার নামাজ আদায় করার জন্যে তিনি তড়িঘড়ি এসে মসজিদে ঢুকেছিলেন। তিনি যখন ঢুকলেন তখন রেজা সাহেব বক্তৃতা শুরু করেছিলেন। নামাজ শেষে এই আলেম সাহেব তাজ্জব হয়ে মুসল্লীদের জিজ্ঞাসা করলেন—ইনিই কি আপনাদের এই মসজিদের রেগুলার, মানে বরাবরের ইমাম?

জবাবে মসজিদের খাদেম সাহেব বললেন না-না, ইনি নতুন লোক। আমাদের বান্ধা— খতিব অসুস্থ থাকায় ইনি আজ ইমামতি করলেন।

তা-ই বলুন। তা এতবড় একজন আলেম আপনারা হঠাৎ করে যোগাড় করলেন কোথেকে?

ইনি গাঁয়েই থাকেন। আমাদের হাইস্কুলের থার্ডপণ্ডিত ইনি।

কি পণ্ডিত বললেন?

থার্ডপণ্ডিত। মানে, বাংলা আর বাংলা ব্যাকরণ পড়ানো পণ্ডিত।

আগন্তুক আলেমটি বিপুল বিস্ময়ে বললেন—সেকি! বাংলা পড়ানো লোকের এমন ইসলামী জ্ঞান আর আরবী ভাষার উপর এতটা দখল—এতো সচরাচর দেখা যায় না! তাঁরা তো অধিকাংশরাই রবীন্দ্র-বঙ্কিম আর জাত বিজাতের কৃষ্টি কালচার নিয়ে মাতামাতি করেন। ইসলামের দিকে তেমন একটা তাকায়ই না। এ লোক তো দেখছি দারুণ এক ব্যতিক্রম। একটা রহস্যই বলা চলে!

এ কথা সমর্থন করে উপস্থিত অনেকেই বলে উঠলেন— ঠিক বলেছেন জনাব, ঠিক বলেছেন। আমাদের কাছেও ইনি একটা রহস্যই বটে। ইনাকে ঠিকমতো আজও আমরা চিনে উঠতে পারলাম না। www.boighar.com

এবার ঐ আলেম সাহেব রেজা সাহেবের কাছে এসে সরাসরি প্রশ্ন করলেন—স্কুলে আপনি বাংলা সাহিত্য আর বাংলা ব্যাকরণ পড়ান, শুনছি। আরবী, ফার্সী, ইসলামিয়াত-এসবও কি পড়ান?

রেজা সাহেব হেসে বললেন— জি-না জি-না। বাংলা সাহিত্যই খুব ভাল লাগে আমার। আমি মূলত ঐ বাংলা সাহিত্য নিয়েই থাকি।

কী আশ্চর্য! তাহলে ইসলামের উপর আপনার এই দখল —

: দখল এমন কিছু নয়। তবে আগে আমি মাদ্রাসায় পড়েছি। এসএসসি পরীক্ষা দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত মাদ্রাসারই ছাত্র ছিলাম। পরে এসে জেনারেল লাইনে ভর্তি হই আর জেনারেল লাইনেই এসএসসি পরীক্ষা দিই। তারপর থেকে জেনারেল লাইনেই পড়াশোনা করে গেছি।

সাব্বাস! এরপরও আরবী ভাষা আর ইসলামের উপর এতটা দখল আছে আপনার?

থাকতেই হবে। মাদ্রাসায় পড়ি আর না পড়ি, ভুলে গেলে চলবে না যে, আমরা মুসলমান। ইসলামই আমাদের জীবনের সব। ইহকাল ও পরকালের পাথেয়। কাজেই ইসলামের উপর মোটামুটি জ্ঞান আর আরবী ভাষায় লেখা পবিত্র কোরআন শরীফ পড়তে পারার কিছুটা অভ্যাস তো থাকতেই হবে আমাদের।

শুধু এই আলেম সাহেবই নন, উপস্থিত মুসল্লীবৃন্দ সকলেই এক সাথে বললেন—মারহাবা-মারহাবা!

নূরীদের কিমান গরীবুল্লাহও জুমআর নামাজে এসেছিল। নামাজ শেষে সে ছুটতে ছুটতে এসে নূরীকে বললো— ছয়লাব হয়ে গেছে আশ্মাজান, ছয়লাব হয়ে গেছে। আমাদের পণ্ডিত রেজা সাহেবের তারিফে মসজিদ আজ ছয়লাব হয়ে গেছে। মারদিয়া কেব্লা!

গরীবুল্লাহ আনন্দে হাত পা ছুড়তে লাগলো। নূরী সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলো— মারদিয়া কেব্লা মানে? কে কেব্লা মেরেছে?

: আমাদের পণ্ডিত! আবার কে? সবাইকে আজ এক হাত দেখিয়ে দিয়েছেন পণ্ডিত। ওহ! সে কি তারিফ। মুসল্লীরা পায় তো আজ পণ্ডিত সাহেবকে মাথায়

নিয়ে নাচে ।

কি বলতে চাও, তা পরিষ্কার করে বলো তো!

পরিষ্কার করেই তো বলছি। এই কালই তোরা পণ্ডিতকে দেখলেই থুঃ থুঃ করলি, আর আজ? আজ তোদের খোতা মুখ ভেঁতা হয়ে গেল তো? মানুষ চিনিসনে ব্যাটারা?

নূরী বিব্রতভাবে বললো— আহারে! এ আবার তুমি কোন কথায় গেলে আর কার কথা বলছো?

কার কথা বলবো! যারা পরের বদনাম ছাড়া সুনাম করতে জানে না, তাদের কথা বলছি। ঐ পাড়ার ঐ মাতবর বক্শো সাহেব আর তার মতো কিছু নিন্দুকের কথা বলছি। না জেনে না শুনে পরের মুখে ঝাল খেয়ে তোরা একটানা গীবত গাইতে শুরু করলি পণ্ডিতের। এখন? এখন অবস্থাটা কি হলো? তোদের ঐ বড় মুখ চুন হয়ে গেল তো?

আর পারে কে? অধৈর্য হয়ে নূরী সক্রোধে বললো আরে থামো! চুপ্ করো! কি পাগলামি শুরু করেছো তুমি? তোমার কথার কোনই মাথামুণ্ড নেই! কি বলতে এসে কি বলছো তুমি, তা নিজেই বুঝতে পারছো বলে মনে হয় না আমার। আসল কথাটা কি, তাকি একটু খোলাসা করে বলবে?

ঐ তো বললাম, পণ্ডিতের তারিফে মসজিদ আজ মাতোয়ারা!

কি কারণে তাঁর তারিফ হলো এতো? তারিফের কাজটা কী করেছেন তিনি? কী করেছেন? অনেক কিছু করেছেন। ঐ যে, আপনার মামুজান আসছেন। তাঁকেই জিজ্ঞাসা করুন আম্মাজন। তাঁর তারিফ করলো সকলে এটা নিজের চোখে দেখলাম আর নিজের কানে শুনলাম। কি জন্যে তারিফ করলো তা ঠিক ঠিক বোঝাতে হলে অনেক বিদ্যাবুদ্ধি লাগে। সেসব জ্ঞানবুদ্ধি কি আছে আমার যে, আমি তা বোঝাবো?

ইতোমধ্যে কাছে এলেন মৃধা সাহেব। তাঁর চোখ-মুখও খুশিতে চকচক করছিলো। তিনি কাছে আসতেই নূরী প্রশ্ন করলো— মসজিদে আজ কি হয়েছে মামুজান? আমাদের থার্ডপণ্ডিত কি করেছেন সেখানে? এই গরীবুল্লাহ চাচা এসে অবধি একধারছে বকবক করছে, কিছুই বুঝিয়ে বলতে পারছে না।

মৃধা সাহেবও আবেগ ভরে বললেন— বুঝিয়ে বলার ভাষাটা কি আমিই পাচ্ছি মামণি! এমন এক আচানক ঘটনা আজ ঘটবে আগে তা কল্পনা করতেও পারিনি। বলতে পারো, আজ এক মস্তবড় অজানা দিক জানা হয়ে গেল সবার।

ভয়ানক ত্রুদ্ব হয়ে নূরী বললো—আরে দূর! আপনিও ঐ একই পাগলামি শুরু করলেন? থাক, আমার আর কিছু জানার দরকার নেই। আপনারা নিজেরাই হাত-পা ছুড়ে লাফান।

নূরী সক্রোধে সরে যেতে লাগলো। হুঁশে এসে মৃধা সাহেব ব্যস্তকণ্ঠে বললেন—আরে যাও কেন? দাঁড়াও-দাঁড়াও, বলছি সব।

এরপর শুরু থেকে তামাম ঘটনা ও মুসল্লীদের প্রত্যেকের প্রত্যেকটি কথা মৃধা সাহেব এক এক করে বর্ণনা করে গেলেন। শুনে নূরীও বিপুল বিস্ময়ে বললো-বলেন কি মামুজান! এটা তো তাহলে এক মস্তবড় আবিষ্কার।

মৃধা সাহেব গম্ভীরকণ্ঠে বললেন-হ্যাঁ মামণি! লোকটাকে চিনতে বোধহয় বরাবরই ভুল করে আসছি আমরা। এই পণ্ডিতটা বোধ হয় আসলেই একটা ধুলোমাখা মানিক!

পণ্ডিতকে নিয়ে নতুন করে ভাবতে যাওয়ার প্রবল আগ্রহ জাগলেও সে অবকাশ নূরী তখন পেলো না। অল্পক্ষণ পরেই নিজের ভাবনার মধ্যে তাকে নিমগ্ন হতে হলো। ঐ দিনই সন্ধ্যাবেলা নূরীর আক্বা এসে বাড়ির সবাইকে ডাক দিয়ে বললেন-নূরীকে দেখতে নবাবগঞ্জ শহর থেকে লোক আসবে আগামীকাল দুপুরে। বরও সাথে আসবে তাদের। কাজেই তৈরি হয়ে যাও সবাই। আনযাম আয়োজনে এখন থেকেই লেগে পড়ো।

মৃধা সাহেব বললেন-বরও সাথে আসবে মানে? পছন্দ হয়ে গেলে কালই কি তাহলে কলেমা পড়াতে চান?

চৌধুরী সাহেব বললেন-না, ঠিক তা চাইনে। এই একটাই মেয়ে আমার। তার শাদি কি এমন নীরবে দিলে রক্ষণ আছে! সবাই কি ধরে বসবে না আমাকে? কম-বেশি ধুমধাম করেই শাদি দিতে হবে তার। বর আসছে মানে, শুধু অভিভাবকদের পছন্দ হলেই তো আজকাল আর হয় না, বরেরও পছন্দ হওয়া চাই। বরের পছন্দের উপরই নির্ভর করছে সবকিছু। বরের পছন্দ হলে তবেই উঠবে চূড়ান্ত কথাবার্তা। লেনদেন, দিনক্ষণ ইত্যাদি।

ও আচ্ছা।

ও আচ্ছা বলেই চুপ থেকে না মৃধা। শহর থেকে শিক্ষিত লোক আসবে মস্ত মস্ত। বর নিজেও খুব শিক্ষিত ছেলে। তাদের যাতে করে অসম্মান না হয়, সেই মোতাবেক আয়োজনে লেগে পড়ো এখন থেকেই। চাকর কিমানদের ডেকে নিয়ে বৈঠকখানায় বসো গিয়ে। একটু পরেই আমি আসছি। কি কি করতে হবে তার ফর্দ তৈরি করে সে মোতাবেক কাজ করতে হবে, বুঝলে?

বরের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানার ইচ্ছে অনেকের থাকলেও সে সুযোগ কাউকেই না দিয়ে তখনই সেখান থেকে চলে গেলেন চৌধুরী সাহেব।

নূরীর সামনেই এই খবর প্রকাশ করলেন নূরীর আক্বা। খবর শুনে স্বাভাবিকভাবেই নিজের চিন্তায় নূরী তখন নাজেহাল হয়ে পড়লো।

নূরীর শাদির সম্বন্ধ আজ এই একটাই কেবল আসেনি। অনেকদিন ধরেই নানা দিক থেকে যোগ্য-অযোগ্য নানা সম্বন্ধ আসতেই আছে পর পর। দীর্ঘদিন আগে থেকেই নূরীর আক্বা নূরীর জন্য পাত্রের সন্ধান করে চলেছেন একটানা। এজন্যেই পড়াশুনা বন্ধ হয়েছে নূরীর। মাস ছয়েক আগে ফল বেরিয়েছে আইএ পরীক্ষার। সেকেণ্ড ডিভিশানে পাস করেছে নূরী। কিন্তু বাপ আর তাকে শহরে

পাঠিয়ে বিএ পড়াতে মোটেই আগ্রহী হননি। বয়স হয়েছে মেয়ের তাই বিএ পড়ানোর পরিবর্তে তিনি মেয়ের বিয়ে দেয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন নূরীর সেই আইএ পরীক্ষা দেয়ার বেশ আগে থেকেই। অনেক বরের সন্ধানও পেয়েছেন তিনি এ যাবৎ। সবার সাথেই এ যাবৎ কথা হয়েছে মুখে মুখে। প্রাথমিক পর্যায়েই অপছন্দ হওয়ায় বর পক্ষকে মেয়ে দেখানোর পর্যায় পর্যন্ত অগ্রসর হননি নূরীর আব্বা। মাঝপথেই বন্ধ করেছেন কথাবার্তা। কিন্তু এই সম্বন্ধটা পছন্দ হয়েছে তাঁর। এদের সাথে মুখে মুখে কথা বলার পর্যায়েও শেষ হয়েছে। এখন এসেছে মেয়ে দেখানোর পালা। তাই আগামীকাল বরপক্ষ সেই মেয়ে দেখতে আসছে।

পরের দিন দুপুর হয় হয়-এই ওয়াজে বরসহ চলে এলেন বরকর্তারা। চৌধুরী সাহেব তাঁদের সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। সমাদরে তাঁদের এনে বসালেন এবং একটু পরেই সমতুলে খানাপিনা করালেন। এরপরেই নূরীকে এনে তাদের সামনে হাজির করা হলো। বর ও বরপক্ষ কনেকে দেখলেন এবং সেই সাথে কনে ও কনেপক্ষ বরকেও দেখলেন। বরটা স্থূলকায় শ্যামবর্ণের ছেলে। বয়সের তুলনায় বরের দেহে মাংস লেগেছে অনেক বেশি। দেহের তুলনায় মাথাটা একটু ছোট। মুখের কাটিং খারাপ না হলেও আকর্ষণীয় নয়। কেমন যেন ফোলা ফোলা গাল। কাজেই প্রথম দর্শনেই নূরী তাকে বর্জন করলো মনে মনে। চেহারার প্রশ্ন প্রকট হয়ে না উঠলেও দাবি দাওয়ার প্রশ্নে নূরীর বাপকেও এ শাদি থেকে পিছু হটতে হলো।

বর বিএ পরীক্ষার পর আইন পাস করেছে। এখন সে ব্যারিস্টারি পড়ার জন্যে বিলেত যেতে চায়। ব্যারিস্টারি পাস করে এসে রাজধানী ঢাকাতে চেম্বার খুলে বসতে চায়। বিলেত থেকে এই ব্যারিস্টারী পড়িয়ে আনার এবং ঢাকায় জায়গাজমি কিনে বসবাসের ঘরদুয়ার বানিয়ে চেম্বার খুলে দেয়ার তামাম খরচ কনের বাপের কাছে দাবি করলো বরপক্ষ। সবকিছু মিলে লক্ষ টাকার ব্যাপার নয়, কোটি টাকার উপরে খরচ। কনের বাপের অবস্থা ভাল ঠিকই। কিন্তু কোটি টাকা খরচ করে মেয়ের বিয়ে দেয়ার মতো অবস্থা তাঁর নয়। একথা বরপক্ষকে তিনি বিশেষভাবে বোঝালেন। কিন্তু বরপক্ষ একদম অনড়। নূরী অত্যন্ত সুন্দরী মেয়ে। কিন্তু বরপক্ষের জেদ দেখে বোঝা গেল, নূরীর রূপের চেয়ে নূরীর বাপের রূপার দিকে লক্ষ্য তাদের অধিক। চাহিদায় বরপক্ষ বিশেষ নমনীয় না হওয়ায়, বরসহ বরকর্তাদের বিদায় করতে বাধ্য হলেন চৌধুরী সাহেব।

অতঃপর চৌধুরী সাহেব আবার তৎপর হয়ে উঠলেন। সম্ভবপর চাহিদার মধ্যে অন্যত্র আবার ব্যস্তভাবে বর খুঁজতে লাগলেন তিনি। অপরদিকে নুসরত জাহান নূরী ব্যস্তভাবে খুঁজতে লাগলেন এমন পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের উপায়। কম পয়সায় হোক আর বেশি পয়সায় হোক, বাপ-মা যাকে যোগাড় করে এনে দেবেন, তারই গলা ধরে ঝুলে পড়ার রুচি নূরীর কোনদিনই ছিল না।

নিজের পছন্দমতো কাউকে শাদি করার আকাঙ্ক্ষা তার আজন্মের। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য, আজ পর্যন্ত তার সেই পছন্দ করা কাউকে জুটিয়ে নিতে পারেনি সে। অন্যকথায়, যেমনটি সে চায়, তেমনটি কাউকেই সে আজ পর্যন্ত পায়নি। অথচ অনেক মেয়ে স্কুলে থাকাকালেই একজন না একজনকে খুঁজে পায় মনের মতো। তাদের সেই কম বয়সের খুঁজে পাওয়ার স্থায়িত্ব যা-ই হোক, শাদি পর্যন্ত গড়াক আর না গড়াক, ছোটকালেই অনেকে অবলম্বন একটা যোগাড় করে ফেলে। কিন্তু নূরী তা পারেনি। আইএ পরীক্ষা দেয়ার বেশ আগে থেকেই নূরীর শাদির ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন তার আকাঙ্ক্ষা। অথচ নূরী তখনও কোন মনের মানুষ বাছাই করতে পারেনি। মনে ধরার মতো একজনকেও পায়নি। পায়নি আইএ পরীক্ষা শেষ করে বাড়িতে ফিরে আসার দিন পর্যন্ত।

এ নিয়ে চিন্তার অবধি ছিল না নূরীর। মনের মতো না হলে, যাকে তাকে নিয়ে সে ঘর করবে কি করে— এই চিন্তায় সে অস্থির ছিল সব সময়। অসুস্থ রেজা সাহেবকে গাড়ি থেকে বাড়িতে আনার পর এই দুশ্চিন্তা বিপুলাংশে লাঘব হয় নূরীর। রেজা-সাহেবের চেহারা আর চরিত্র অল্পদিনের মধ্যেই আকর্ষণ করে নূরীকে এবং কালক্রমে নূরী নিজের অজ্ঞাতেই রেজা সাহেবকে তার সেই কাম্যজন হিসেবে নির্বাচন করে ফেলে। শুধু নির্বাচনই করে না, তার চাওয়ার অনেক বেশি সে পেয়ে গেছে বোধে রেজা সাহেবের মধ্যে বিলকুল হারিয়ে ফেলে নিজেকে। স্বপ্ন দেখতে থাকে নিত্য নতুন।

কিন্তু তার পরেই অপ্রত্যাশিতভাবে ধাক্কা এসেছে মস্তবড়। দশচক্রে ভগবান ভূত হওয়ার মতো দশজনের রটনার মাধ্যমে রেজা সাহেবের চরিত্রের মধ্যে নারীঘটিত বিরাট এক দুর্বলতার দিক দেখতে পেয়েছে নূরী। তার সেই নিত্যনতুন স্বপ্নগুলো এতে করে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়ার দ্বারপ্রান্তে এসে উপস্থিত হয়েছে। কৃষ্ণার সাথে রেজা সাহেবের প্রেম আর সম্প্রতি সালেহার প্রতি রেজা সাহেবের আকর্ষণের ব্যাপারটা নূরীকে আছাড় মেরে আসমান থেকে জমিনে ফেলে দিয়েছে।

শেষ অবলম্বনটুকুও তার শেষ হয়ে গেল বলে নূরীর অন্তরাঝা যখন আর্তনাদ করে ফিরছে, সেই সময় এল মসজিদের ঐ খবর। রেজা সাহেবের সেখানে বিপুল তারিফ আর সুখ্যাতির খবর। সাথে সাথে তার মামুজানের মুখে উচ্চারিত হলো— “এই পণ্ডিতকে চিনতে বরাবরই আমরা বোধহয় ভুল করে আসছি। এই পণ্ডিতটা আসলেই বোধহয় একটা ধুলোমাখা মানিক।”

মরা দেহে প্রাণ ফিরে আসার মতো আবার উজ্জীবিত হয়ে উঠলো নূরী। রেজা সাহেবকে নিয়ে আবার নতুন করে ভাবতে বসলো সে। তাকে দেখতে আসা বর আর বরকর্তারা বিদেয় হতে না হতেই রেজা সাহেবকে নিয়ে নূরী আবার জোরদারভাবে ভাবতে শুরু করলো। ভাবতে লাগলো, সামান্য একজন থার্ডপণ্ডিত হলেও এবং সে কারণে অর্থনৈতিক অবস্থা তার তুলে ধরার মতো

কিছু না হলেও, মানুষ হিসেবে রেজা সাহেব একজন অনন্য ও অতুলনীয় মানুষ। এমন মানুষ কালেভদ্রে এক আধটা দেখা যায়। রমণীঘটিত ঐ দুর্বলতাটা তার না থাকতো যদি, তাহলে এমন মানুষকে নিয়ে অকূল দরিয়াতেই ঝাঁপিয়ে পড়া যায়। ভাবতে লাগলো, আদব আখলাক যার এতটা উত্তম, এবাদত বন্দেগীতে যে এতটা বড়, তার চরিত্রে এ দুর্বলতা স্থান পায় কি করে! একি করুণ অসঙ্গতি।

মানুষের শেষ ভরসা আল্লাহ। সেই আল্লাহর কাছেই অবশেষে হাত তুললো নূরী। কায়মন-প্রাণে প্রার্থনা করতে লাগলো— “হে আল্লাহ, যেসব বদনাম তার ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে তা মিথ্যা হয়ে যাক, সম্পূর্ণরূপে তা ভিত্তিহীন হোক।” নিদ্রায়-জাগরণে, শয়নে-স্বপনে সে এই একই আরজ আল্লাহ তায়ালার দরবারে পেশ করতে লাগলো।

www.boighar.com

অবশেষে গৃহীত হলো আরজ। আল্লাহতায়ালার প্রার্থনা তার মঞ্জুর করলেন অচিরেই। অচিরেই তামাম আঁধার কেটে যাওয়া শুরু হলো একে একে।

থার্ডপণ্ডিত আমির রেজা সাহেব স্কুলে গিয়ে ছিলেন। নূরীর আশ্মা আশিয়া বেগম সাহেবা অপেক্ষাকৃত সুস্থ হয়ে ওঠায় সোহাগীর কাঁধে ভর দিয়ে অনেক দিন পরে অন্দরের বাইরে বাহির আঙ্গিনায় এসেছিলেন। নূরীও বাহির-আঙ্গিনায় বেরিয়ে এলো মায়ের পিছে পিছে। চৌধুরী সাহেব ও মৃধা সাহেব বৈঠকখানার বারান্দায় বসে কথা বলছিলেন কিমান গরিবুল্লাহর সাথে। এই সময় সেখানে এসে হাজির হলো মাধব মোহন্ত। কৃষ্ণার বাপ মাধব সাঁওতাল।

মাধব মোহন্ত এসে বারান্দার নিচে দাঁড়ালো এবং চৌধুরী সাহেবদের উদ্দেশে মাথা নোয়ায়ে বললো পেন্নাম হই চৌধুরী ছাহেব। উ পুণ্ডিত ছাহেব কি মকানে আছে? উ রেজা পুণ্ডিত ছাহেব?

বাইরের লোক আসতে দেখে নূরীর আশ্মা সোহাগীকে ধরে নিকটেই একটু আড়ালে এসে দাঁড়ালেন। রেজা সাহেবের কথা ওঠায় নূরী দ্রুতপদে আর একটু কাছে এগিয়ে এলো। মাধবের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে চৌধুরী সাহেব আগে সবিস্ময়ে বললেন—একি, মাধব মোহন্ত যে! তুমি হঠাৎ এখানে?

মাধব মোহন্ত হাসিমুখে বললো—দুরকার পড়ি গেইচে চৌধুরী ছাহেব। জরুরি দুরকার পড়ি গেইছে।

দরকার ! কি সে দরকার?

বুলবো-বুলবো। বুলার লেগেই হামি ইখানে এছেছি। তা উ রেজা ছাহেব কাঁহা, বাতাইয়ে আগারী।

ওতো স্কুলে। তাকে কি দরকার?

তাকেই তো দুরকার খুব বেছি। জিয়াদা দুরকার।

জিয়াদা তো বুঝলাম। কি জন্যে তাকে দরকার?

হামার বেটি কুছনার ছাদির লাগি দুরকার। ছেই লেগেই হামি লিজে এসেছি

বটে।

এ কথায় সকলে উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন। মৃধা সাহেব নাখোশকণ্ঠে বললেন—কৃষ্ণার শাদির জন্যে এই পণ্ডিতকে দরকার মানে? ঐ পণ্ডিতকে নিয়ে এত টানাটানি করছে কেন তোমরা? ঐ জিদ ধরেই আছে এখনো?

আজ্ঞে?

ঐ পণ্ডিতকে এখনো টানছে কেন?

হাইরে বা! টানবেক লাই কেনে? হামার বেটির কি ছাদি দিবেক লাই হামি?

তাজ্জব! এই জন্যেই পণ্ডিতকে চাই?

হঁ-হঁ, ওহি ঠিক বাত্। পুণ্ডিত লাইতো হামার বেটির ছাদি হোবে কি করি, বাতাইয়ে? ছাদির লেগেই পুণ্ডিতরে দুরকার।

মৃধা সাহেব রুস্তকণ্ঠে বললেন— তার মানে? ঐ পণ্ডিতের সাথেই শাদি দেবে তোমার বেটির? ভেবেছো কি তোমরা?

কথাটা অনুধাবন করতে না পেরে মাধব মোহন্ত ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলো মৃধা সাহেবের দিকে। এ কথায় নূরীর বুকে কাঁপন ধরে গেল। মৃধা সাহেব আরো অধিক ক্ষিপ্তকণ্ঠে বললেন—চেয়ে রইলে যে, আমার কথাটা কি বুঝতে পারোনি তুমি?

মাধব মোহন্ত অসহায়কণ্ঠে বললো— লাই বাবু! হামি তো কুচু বুঝিলো না।

মৃধা সাহেব উচ্চৈকণ্ঠে বললেন— তোমার বেটি কৃষ্ণার শাদিটা এই পণ্ডিতের সাথেই দেবে তাহলে?

চমকে উঠে দুই হাতে দুই কান চেপে ধরে মাধব মোহন্ত ভীতকণ্ঠে বললো— রাধামাধব-রাধামাধব! একি বাত্ হামারে ছুনাইলেন মিরদা ছাহেব? ই পাপ বাত্ হামারে ছুনাইলেন কেনে?

পাপ বাত্?

জরুর পাপ বাত্। জবোর গুনাহর কুতা বটে।

তার মানে? কৃষ্ণার শাদি তাহলে পণ্ডিতের সাথে দিচ্ছে না?

লাই লাই, হরগিজ্ লাই। তা দেবে কেনে? পুণ্ডিত ভিন্ জাতি। হামরা জাত দেবে কেনে?

মোহন্ত!

উস্ছে জিয়াদা কুতা পুণ্ডিত হামার কৃছনার গুরুআদমী আছে। মাস্টারআদমী। হামার বেটি কুন্তির মাস্টার তো কৃছনার ভি মাস্টার। গুরুআদমীর ছাতে কৃছনার ছাদি হইবেক কেনে?

তাহলে?

কৃছনার ছাদি হোবে উও বনোয়ারীর ছাতে। হামাদের উ পাড়ার উও বনোয়ারী দাছ-উহার ছাতে।

সেকি! বনোয়ারীর সাথে শাদি?

হঁ-হঁ! ইচ্ছা নিয়েই তো পুণ্ডিতেরে নেমতন্ন করতি হামি ই খানে আছিলো। আগামীপরছু ওহি ছাদি।

দম সরলো উপস্থিত সকলের। মৃধা সাহেব হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। নূরীর বুক থেকে শুধু পাথরই নয়, যেন হিমালয় পর্বতটা নেমে গেল গোটাই। মৃধা সাহেব এবার প্রশ্নকণ্ঠে বললেন- বলো কি মোহন্ত? তুমি সেই শাদির দাওয়াত দিতে, মানে নেমন্তন্ন করতে এসেছো!

মাধব মোহন্ত বললো-ওহি ছাহেব, ওহি-ওহি-ওহি বাত বটে।

কিন্তু মোহন্ত, আমরা তো শুনেছি তোমার মেয়ের শাদি ঐ মুরারী মোহন্তের সাথেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল। ঐ বৃদ্ধ মুরারী মোহন্ত!

হঁ, তা ঠিক হইছিল জরুর।

সেই শাদি নাকি ভেঙে দিয়েছে এই পণ্ডিত।

উ বাত্ ভি ঠিক। পুণ্ডিতের কুতাতেই হামি ভাঙি দেইচি বটে।

: তাহলে পণ্ডিত এ কাজ করলো কেন? আমরা তো শুনেছি, পণ্ডিত নিজে শাদি করবে বলে ভেঙে দিয়েছে ঐ বিয়ে!

লাই-লাই, নিজের লেগে লাই। পুণ্ডিত উ বনোয়ারীর লেগেই কাম করি দিলো বটে।

বলো কি! বনোয়ারীর জন্যে?

হঁ-হঁ। বাত্ তো ওহি বাত্ বটে। উ বনোয়ারী কৃছনারে জব্বোর পেয়ার করে। কৃছনা ভি উহারে বহুত পেয়ার করে। জব্বোর ভালবাসা। বহুপন কাল থাকি উও দুনো ভালবাসে দুনোরে। বুঢ়া মুরারী রে ছাদি করিতে কৃছনা রাজি হইলেক লাই বিলকুল কৃছনা বনোয়ারীরে ছাদি করার লেগে পুণ্ডিত রেজা ছাহেবের ছোব কুতা বুলিয়ো দিলো বটে।

পণ্ডিতকে বললো?

মিনতি ভি করিলো। বহুত মিনতি। ছব কুতা ছুনি কৃছনার মিনতি পণ্ডিত কবুল করিল। ব্যাস্, ছেই থাকি পুণ্ডিত হামারে ছমঝাইতি লাগি গেল বটে।

পণ্ডিত লেগে গেলো আর অমনি তুমি সমঝে গেলে? মানে এমনি তুমি বনোয়ারীর সাথে কৃষ্ণার শাদি দিতে রাজি হয়ে গেলে? www.boighar.com

লাই-লাই। এক-রোজ দো-রোজ কা অন্দর হামি রাজি হইলেক লাই বিলকুল। পুণ্ডিত হামারে বহুতদিন ছমঝাইলেক বটে। পাঁচ ছয় রোজ হোবে জরুর। বার বার পুণ্ডিত হামার মকানে আছিতে লাগিল আওর ছমঝাইতি থাকিত। হামি আখুন কি করবেক, কহিয়ে? হামি জমিন পাইবার আছায় ওহি বুঢ়া মুরারীর হাতে কৃছনার ছাদি দিতে চাইলাম। কিন্তু পুণ্ডিতের মিঠা বাত্ হামারে মজাইয়া দিলো।

মৃধা সাহেব সাথহে প্রশ্ন করলেন-কি রকম-কি রকম?

মাধব মোহন্ত বললো- পুণ্ডিত কহিলো, বনোয়ারীর ছাতে কৃছনার ছাদি হোবে

তো কৃছনা জন্মের ছুখী হোবে। জিন্দেগীভর বহত ছুখে দিন কাটাইবে। উও বুঢ়টার ছাতে ছাদি দেবে তো কৃছনা বহত দুখ পাইবে। ছারা জিন্দেগী কান্দি কান্দি হয়রাণ হই যাইবেক। বেটি কান্দি কান্দি হয়রাণ হই যাইবেক। বেটি কান্দি কান্দি মরি যাইবেক আওর তু মুরারীকা জমিন বুকে চাপি ধরি ড্যাং ড্যাং করি লাচিবেক? এ তু কেমুন বাপ আছিছ বটে?

তারপর?

উ পুণ্ডিত দেউতা আদমী। উহার বাত বহত মিঠা বাত। উ মিঠা বাত ছুনি হামার ধান্কা কাটি গেল বটে। হামার হুঁছ ফিরি আছিলো। হামি খেয়াল করি দেখিলো, ইয়ে বাত তো বিলকুল ঠিক। লিজের বেটির ছুখ কোরবান করি দি হামি জমিন কামাই লিবো? লাই-লাই, ইতো, কভ্ভি হোতে পারেক লাই! হামি জমিনের ধান্দা ছাড়িয়া দিলো আওর বনোয়ারীর ছাতে কৃছনার ছাদি দিতে রাজি হই গেলো।

রাজি হয়ে গেলে?

: জরুর হোতে হোবে। উ পুণ্ডিত তো বিলকুল দেউতা আদমী আছে। ছরগের দেউতা। উহার বাত বহত পবিত্তর বাত। দীল ভি উহার দেউতা মাফিক বিলকুল ছাফা। উহার বাত খারিজ করিবে তো আখেরে পুস্তাইতে হোবে ঠিক ঠিক। ছাতছাত, জন্মের গুনাহ হই যাইবেক। লরকে যাইতে হইবেক জরুর।

আচ্ছা।

হাপনারা ভি বহত আচ্ছা আদমী আছে। লেকদার আদমী। উ দেউতা আদমীরে মকানে রাখি জন্মের ছওয়াবের কাম করি লইচেন বটে।

চৌধুরী সাহেব এতক্ষণ নীরবে সব শুনে গেলেন। এবার তিনি বললেন—তা আমাদের কথা থাক। তুমি কিন্তু এতদিনে সত্যিই একটা ছওয়াবের কাম করতে যাচ্ছে মোহন্ত। ঐ বন্ধ মুরারীর সাথে বেটির শাদি দিলে মস্তবড় গুনাহর কাজ করে ফেলতে তুমি।

মাধব খুশি হয়ে বললো—আলবত্ আলবত্। ই বাত বিলকুল ঠিক। ইছলিয়ে হামি উকামে যাইলেক লাই বটে। আগামীপরছু বনোয়ারীর ছাতে হামি কৃছনার ছাদি লাগাই দিবেক ঠিক-ঠিক। পুণ্ডিতেরে নেমন্তন্ন না করি উ ছাদি হামি লাগাই কি করি, কহিয়ে, উ পুণ্ডিতই তো ই ছাদি গুছাই দিলেক বিলকুল।

হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঘটনা যা বললে তাতে পণ্ডিতকে দাওয়াত করা একান্ত দরকার তোমার। তা না করলে মস্তবড় অন্যায় করা হবে।

হঁ-হঁ। ইছলিয়ে হামি ই খানে আছিয়াছি বটে।

পণ্ডিত এখন স্কুলে আছে মোহন্ত। তুমি সেখানে যাও। সেখানে গিয়ে দাওয়াত করো তাকে।

যাইবেক-যাইবেক, জরুর যাইবেক। লেকিন হাপনাদের ভি হামি নেমন্তন্ন জানাই দিছি বটে। হামার বেটির ছাদিতে হাপনাদের ভি যাইতে হোবে জরুর।

ছাড়িয়া কুতা লাই, হাঁ।

মাধব মোহন্ত হাসতে লাগলো। জবাবে মৃধা সাহেব বললেন— আচ্ছা আচ্ছা সেটা দেখা যাবে। নিজেরা পারি না পারি, পণ্ডিতের সাথে এ বাড়ির কাউকে না কাউকে অবশ্যই পাঠিয়ে দেয়া হবে। তুমি পণ্ডিতকে দাওয়াত করার ব্যবস্থা করোগে।

মাধব মোহন্ত আবেগ ভরে বললো— ওভি আচ্ছা, ওভি আচ্ছা আমি আখুন জরুর পুণ্ডিতরে দাওয়াত কোরবেক, হাঁ।

খুশিতে দুলতে দুলতে বিদায় হলো মাধব মোহন্ত। মাধব মোহন্তের বিদায়ের পরেও যে যেখানে ছিলেন সেখানেই সবাই নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে বসে রইলেন। 'রা' সরলো না কারো মুখে। সকলেরই চোখে-মুখে আনন্দ বিস্ময়ের প্রগাঢ় ছাপ। সবাই পুনঃপুনঃ মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন। অবশেষে নীরবতা ভঙ্গ করে চৌধুরী সাহেব বললেন— তাজ্জব! এই তাহলে আসল ঘটনা! অথচ শূন্যের উপর আমরা কেমন হাত-পা ছুড়ে লাফাচ্ছি। ছিঃ-ছিঃ এ নিয়ে কি বদনামটাই না আমরা করে বেড়াচ্ছি ছেলেটার!

মৃধা সাহেব বললেন— হ্যাঁ হ্যাঁ, তাইতো হলো দেখছি ব্যাপারটা! হেডমাস্টার সাহেব তো সেবার ঠিকই বলেছিলেন—"Wait and see to the last". অর্থাৎ অপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত দেখো কি হয়।

চৌধুরী সাহেব বললেন— এলেমদার মানুষ; এলেমদার মানুষ। এলেমদার আর বেএলেমদারের তফাতটা এখানেই।

অতঃপর কেউ কেউ আরো কথা বলতে শুরু করলো। কারো কথায় কান দেয়ার সামর্থ্য তখন একবিন্দুও ছিল না নূরীর। অপরিসীম আনন্দ আর সীমাহীন আবেগ চেপে রাখতে না পেরে নূরী তখন পড়িমরি দৌড় দিলো অন্দরে।

অনেকটা কাকতালীয় ব্যাপার। একদিন পরেই আমজাদ হোসেনের আশ্মা, অর্থাৎ সালেহার আশ্মা সালাউদ্দীনের সাথে সালেহার শাদির দাওয়াত নিয়ে হাজির হলেন চৌধুরী সাহেবের বাড়িতে। তাকে দেখেও প্রথমে সবাই বিস্মিত হলেন। সালেহার আশ্মা একে একে ব্যাখ্যা করলেন তামাম ঘটনা। সালাউদ্দীনের সাথে সালেহার গভীর ভালবাসার কথা, রেজা সাহেবের হস্তক্ষেপে সালাউদ্দীনের স্কুলের মঞ্জুরি হয়ে যাওয়াসহ সালাউদ্দীনের সেখানে চাকরি হওয়ার কথা এবং বিনিময়ে সালাউদ্দীনের আক্বা খুশি হয়ে সালেহার সাথে ছেলের বিয়ে দেয়ার কথা সবকিছু বর্ণনা করে গেলেন। সবশেষে বললেন— সালাউদ্দীনের আর সালেহার ভালবাসাটা ব্যর্থ হতে না দেয়ার আর তাঁর গরিব সংসারটা বর-কনের চাপে মিসমার হতে না দেয়ার জন্যেই থার্ডপণ্ডিত সাহেব কষ্ট করলেন এতো। এমন মহৎ মানুষ এ দুনিয়ায় দুর্লভ।

বিস্ময়ে ও আনন্দে আর একদফা আলোড়িত হয়ে উঠলো চৌধুরী সাহেবের বাড়ি।

প্রবল বর্ষাণের পর আকাশ যেমন মেঘমুক্ত হয়ে যায়, বেরিয়ে পরে নির্মল নীলিমা, সেইরকম এ সব ঘটনা প্রবাহে রেজা সাহেবের তামাম বদনাম ধুয়ে মুছে গেল। নির্মল ও নিষ্কলুষ মানুষ থার্ডপণ্ডিত আমির রেজা সাহেব আবার আবির্ভূত হলেন স্বকীয় মহিমায়। সর্বত্রই আবার প্রতিষ্ঠিত হলো তাঁর সুনাম এবং তিনি সমাদৃত হতে লাগলেন সকল পরিমণ্ডলে।

নূরী আর নিজেকে সামলে রাখে কতক্ষণ? অনুশোচনায় কয়েকদিন দগ্ধ হওয়ার পর শরম-সংকোচ দ্বিধা সবকিছু ছুড়ে ফেললো নূরী। একপা দু'পা করে সে চলে এলো রেজা সাহেবের ঘরে। ওড়নায় ভাল করে গা-মাথা ঢেকে সে রেজা সাহেবের সামনে এসে দাঁড়ালো চা-হাতে।

নূরী অতঃপর তাঁর কাছে আসবে, এ আশা রেজা সাহেবের ছিল। অনেকখানি বড় আশা। তার সে আশা বাস্তবায়িত হওয়ায় মনে মনে অত্যন্ত খুশি হলেন তিনি। কিন্তু বাইরে সেটা প্রকাশ না করে বিস্ময়ের ভাব করে বললেন—একি, হঠাৎ আজ আপনি যে?

দৃষ্টি নামিয়ে নিয়ে নূরী ধীরকণ্ঠে বললো— বিস্মিত হচ্ছেন?

রেজা সাহেব বললেন—হ্যাঁ, তা খানিকটা হচ্ছিই তো।

আজ কি এই নতুন আপনার ঘরে এলাম? এর আগে কি কখনো আসিনি? এসেছেন। কিন্তু সেটা অনেক দিন আগে।

তখনও কি বিস্মিত হয়েছেন আপনি?

না, তখন বিস্মিত হইনি। তখন তো আপনি আমার খুব পরিচিতজন ছিলেন। অর্থাৎ সবসময় খুব কাছাকাছি ছিলেন।

কাছাকাছি?

হ্যাঁ, অসুস্থ আমাকে বাড়িতে আনার পর থেকে আপনিই তো সবসময় আমার তদ্বির করেছেন আর কাছাকাছি থেকেছেন।

তাই তখন পরিচিত ছিলাম? আমাকে দেখে বিস্মিত হওয়ার কিছু ছিল না? জি,—জি, তাই।

এখন আমি অপরিচিত হয়ে গেছি?

না, ঠিক অপরিচিত নয়। তবে—

তবে অপর অন্যজন হয়ে গেছি আর তাই কাছাকাছি আসিনে, এইতো?

হ্যাঁ! কই আর তা আসেন!

আপনার খোঁজখবরও আর রাখিনে, তাই নয়?

এ কথায় বাধা দিয়ে রেজা সাহেব বললেন—না না, সেটা বলবো না। তাহলে ঘোর মিথ্যা বলা হবে। সোহাগী বলেছে, আপনি সবসময় আমার খবর রেখেছেন আর সোহাগী এ যাবৎ যা করেছে, আপনিই সোহাগীকে দিয়ে তা করিয়েছেন।

বলেছে নাকি?

জি- জি, সোহাগী সব বলেছে। বলেছে, আর কেউই আমার কথা তেমন আর ভাবে না, শুধু আপনিই সব সময় আমার কথা ভাবেন।

হুঁউ! খবর তো অনেকখানি রাখেন দেখছি।

জি?

চা-টা আগে খেয়ে নিন, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

: এঁয়া? তা এখনই আবার চা কেন? একটু আগেই তো সোহাগী চা-নাশতা সবই খাইয়ে গেল।

একটু পরে আর এক কাপ খেতে দোষ নেই। খেয়ে নিন।

রেজা সাহেব চায়ের কাপে মুখ লাগালেন। নূসরত জাহান দাঁড়িয়ে রইলো। সামনে চা পান শেষে শূন্য কাপ রাখতে রাখতে রেজা সাহেব হাসিমুখে বললেন-সোহাগী না বললে বুঝতেই পারতাম না এ বাড়িতে আর কেউ আমাকে নিয়ে ভাবে।

তাহলে কি করে ভাবলেন, আমি আপনার পর হয়ে গেছি?

কাছে আর আসেন না তো, তাই। www.boighar.com

কেন কাছে আসিনে, সেটা ভেবে দেখেননি?

তা আবার দেখিনি? আমি সাঁতাল পাড়ায় যাই। আমার গায়ে সাঁতাল-সাঁওতাল গন্ধ থাকে। তাই কাছে আসেন না।

বটে! কে বললো সে কথা?

কেন, আপনিই তো বলেছিলেন সেবার?

সেটা তো রাগের কথা। সেটা কি আসল কথা?

তাহলে আসল কথা কি?

: কৃষ্ণাকে শাদি করার জন্যে আপনি পাগল হয়ে উঠেছেন শুনে আর কাছে আসিনি। একজন সাঁতালনী অহরহ কাছে থাকবে যার, তার কাছে গিয়ে আর লাভ কি? এই চিন্তায় আসিনি।

তাহলে সবাই যখন আমার কথা ভাবাটা একদম ছেড়ে দিলো, তখনও আমাকে নিয়ে আপনি ভেবে গেলেন কোন লাভের চিন্তায়?

জি-না, লাভ নয়। কোন লাভের চিন্তা নসীবে আমার টিকে না। যে অসুস্থ মানুষটাকে বাড়িতে এনে এত কষ্ট করে সারিয়ে তুললাম, তার প্রতি কি কোন দরদ থাকবে না আমার? সেই দরদেই আপনার কথা যেটুকু হয়, ভেবেছি।

শুধু সেই দরদেই? আর কিছু নয়?

আর আবার কি হবে? আপনি কৃষ্ণার হয়ে গেলে পরের মানুষকে নিয়ে আর ভাবে কে? তখন তো সবার সেই ধারণাই ছিল।

তা বটে। শুধু কৃষ্ণারই নয়, সেই সাথে সালেহারও মানুষ হয়ে গিয়েছিলাম

আমি, তাই নয়?

নতমস্তক আর একটু নত করে নূরী সলজ্জ হাসিমুখে বললো-জি জি, তাই আমরা ভেবেছিলাম।

রেজা সাহেব এবার গম্ভীরকণ্ঠে বললেন- ভেবে আমি তাজ্জব হই, এমন একটা অবাস্তব আর অসম্ভব ব্যাপারকে আপনারা বাস্তব বলে ধরে নিলেন কি করে?

অপরোধীর মতো নূরী ক্ষীণকণ্ঠে বললো-চারদিকে যেভাবে প্রচার হয়ে গেল আর সবার মুখে মুখে যেভাবে ফিরতে লাগলো কথাটা, তাই—

তাই আপনারা বাস্তব বলে ধরে নিলেন?

জি-জি।

চিলে কান নিয়ে গেছে— এই গুজব শুনেই আপনারা চিলের পেছনে দৌড়াতে শুরু করলেন? কানে হাত দিয়ে দেখলেন না একবারও?

: বললামই তো, প্রচারটা এতই জোরদার হয়ে উঠলো যে, হাত দিয়ে দেখার পর্যায়টাই পার হয়ে গেল। একদম সত্যবোধে হাত দিয়ে দেখার গরজটাই আর কারো রইলো না।

একদম সত্য বলে ভাবলো সবাই?

জি-জি।

আপনিও তাই ভাবলেন।

জি?

আমার প্রতি বিশ্বাসটা আপনার এতই ঠুনকো যে, এতদিন এত কাছে থেকে আমাকে দেখার পরও একটা গুজবেই হারিয়ে ফেললেন তামাম বিশ্বাস?

নতমস্তকে দাঁড়িয়ে রইলো নূরী। তৎক্ষণাৎ কোন জবাব দিতে পারলো না। রেজা সাহেব তাকিদ দিয়ে বললেন- কী হলো, কিছু বলছেন না যে?

নূরী মৃদুকণ্ঠে বললো- কি বলবো? ঘটনা যা ঘটে গেল, তাতে আপনার প্রতি আমার বিশ্বাসটা পুরোপুরি হারিয়ে না গেলেও, হারিয়ে তা যায়নি- সেটা প্রমাণ করার আর উপায় নেই। আমরা সত্যিই বড় অন্যায় করে ফেলেছি।

তা বোঝেন?

বুঝবো না কেন? একটা মিথ্যাকে সত্য বানিয়ে আপনার প্রতি যে অন্যায় করেছি আমরা- বিশেষ করে আপনার প্রতি যে অবহেলা দেখিয়েছি আমি- তাতে এ লজ্জা লুকানোর আর জায়গা নেই আমার। কী যে দুর্মতি আমার হলো।

নূরীর মাথাটা একেবারেই নুয়ে পড়লো। গলাটাও কেঁপে উঠলো একটু। রেজা সাহেব অপ্রতিভ হয়ে বললেন- আর না-না, আপনাকে বেশি মিন্ করিনি আমি। আপনার উপর দিয়ে কথাটা চালালেও, আমি সবার কথা বলছি। সবাই যারা এতটা অবজ্ঞা করলো আমাকে, তাদের সবার কথা।

নূরী বললো— সবার এতে কি এসে যায়? গুজবটা সত্য হলেও তাদের কোন

ক্ষতিবৃদ্ধি হতো না, আজ মিথ্যা হয়েছে বলেও তাদের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। ক্ষতিটা তো সবটুকুই আমার।

একি বলছেন?

যা সত্যি তাই বলছি। এ জন্যেই আজ আপনার কাছে আমি এসেছি। চা দেয়াটা একটা অজুহাত মাত্র। আসলে আমি এসেছি আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে।

ক্ষমা চাইতে?

: জি- ক্ষমা চাইতে। ঐ একটা গুজবের জন্যে আপনাকে আমি যতখানি হারিয়েছি, অর্থাৎ আমার দোষেই আমি আপনার নিকট থেকে যতখানি দূরে সরে পড়েছি, এটা আমি সহ্য করতে পারিনি। আমার এ ত্রুটি আপনি মাফ করে দিন।

তার মানে! আপনার এমন কি ত্রুটি হলো?

: আপনাকে আমি দূরে ঠেলে দিয়েছি, এটা কি আমার ত্রুটি নয়? তাই আমার অনুরোধ, আপনার কাছে আমি যে অবস্থানে ছিলাম, আমাকে সেই অবস্থানে আসতে দিন। আমার এই নিঃসঙ্গ জীবনে একটা অবলম্বন হিসেবে আমি পেয়েছিলাম আপনাকে। আমার সেই অবলম্বন হিসেবেই আবার আপনাকে পেতে চাই আমি।

অবলম্বন!

জি। আর না হোক, দুটো সুখ-দুঃখের কথা বলার অবলম্বন, বিপদে-মুসিবতে পরামর্শ নেওয়ার আর উপদেশ-নির্দেশ পাওয়ার অবলম্বন। সর্বক্ষেত্রে, সর্বাবস্থায় আপনার উপর নির্ভর করে থাকতে চাই আমি।

অর্থাৎ ?

আপনি তো দেখতেই পাচ্ছেন, যেখানে সেখানে আমার শাদি দেয়ার জন্য আমার আকাঙ্ক্ষা ভীষণ ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। অথচ আমার পছন্দের মানুষ ছাড়া তাঁদের জুটিয়ে দেয়া কাউকেই শাদি করবো না আমি। জান গেলেও নয়। এ অবস্থায় আপনার সাহায্য সব সময়ই দরকার হবে আমার। আমার কখন কি করা উচিত, তা সবই বাৎলে দেবেন আপনি। আমাকে বিপনুক্ত করতে যা কিছু করার তা সবই আপনি করবেন- এই আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ।

বলেন কি! এতটাই আমার উপর নির্ভর করতে চান?

এতটাই-এতটাই। আপনি ছাড়া এ সমস্যায় নির্ভর করার লোক কেউ আর আমার নেই।

: কিন্তু এ যে বিরাট দায়িত্ব। আমার উপর নির্ভর করলেই যে এ দায়িত্ব পালন করতে পারবো আমি, এ ধারণা হলো আপনার কি করে?

কি করে তা জানিনে। শুধু এইটুকুই জানি, একমাত্র আপনিই তা পারবেন। তাজ্জব! একমাত্র আমিই পারবো?

একমাত্র আপনিই পারবেন, আর কেউ নয়। এমনটি আর কাউকেই পাইনি।

আমি কিছুই বুঝতে পারছি নে। আপনার পছন্দের জন ব্যতিরেকে আর কাউকেই শাদি করবেন না বলছেন। তাহলে আপনার সেই পছন্দের জন কে? সেটা আপনিই বেছে নেবেন।

কেমন কথা! আপনার পছন্দের মানুষ আমি বেছে নেবো কি করে?

কি করে তা আপনিই চিন্তা করবেন। ও চিন্তা আমার নয়।

আশ্চর্য! আমি চিন্তা করবো?

নূরী এবার কাতরকণ্ঠে বললো—দোহাই আপনার, আর প্রশ্ন করবেন না। এরপরেও কি আমাকে বলে দিতে হবে— কে চিন্তা করবে? আমার পছন্দের কে, সেটা আপনি যদি চিনতেই না পারেন, তাহলে এ দুঃখ রাখার আমার জায়গা নেই।

নূরী!

নূরী আরো উদ্বেলিত হয়ে উঠে বললো—লজ্জা-শরম ত্যাগ করে এই যে আপনার কাছে ছুটে এসেছি আমি, তা কি অম্মি অম্মি? আপনাকে একদিন বিপদ থেকে উদ্ধার করেছি আমি। এবার আপনি আমাকে উদ্ধার করবেন—এইটাই আমার পুঞ্জিভূত আশা। মন চায় করবেন, না চায় করবেন না।

আবেগ দমন করতে না পেয়ে তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে ছুটে পালালো নূরী।

www.boighar.com

বলাবাহুল্য, রেজা সাহেব আর নূরী দুইজন যে আগে থেকেই ভালবাসেন দুইজনকে এটা দুইজনেরই পুরোপুরি উপলব্ধির মধ্যে ছিল। অনুক্ত হলেও উপলব্ধির অতীত সেটা ছিল না। এক্ষণে নূরী কি বলতে চায়, সেটা বিলক্ষণ বুঝতে পারলেন রেজা সাহেব। অতঃপর কিছুদিনের মধ্যেই তাদের সেই ভালবাসা আরো অধিক গভীর হয়ে দুজনের কাছেই সরাসরি প্রকাশ হয়ে পড়লো। কারো কাছেই সেটা আর আড়াল বা গোপন রইলো না একটুও। রাখ-টাকের বাঁধন কেটে সেটা বেরিয়ে এলো উদ্যোগ হয়ে। নূসরত জাহান নূরী অবশেষে বলেই ফেললো—তুমিই আমার সেই পছন্দের মানুষ। মনের মানুষ আমার। তোমাকে ঘিরেই যত স্বপ্ন, যত সাধ এ জীবনে আমার।

জবাবে রেজা সাহেবও বললেন—এ স্বপ্ন তো আমারও তোমাকেই ঘিরে। কিন্তু শুধু স্বপ্ন দেখতে থাকলে স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে। বাস্তবরূপ পাবে না। কাজেই তোমার পছন্দের জনকে আপনজন করে নেয়ার দায়িত্ব এখন তোমার। এই বিদেশ বিভূঁইয়ে আমি একদম দাবার বড়ে। সক্রিয় ভূমিকাটা নিতে হবে তোমাকেই।

আমাকেই?

হ্যাঁ। যদিও এই অসম্মান সম্পর্ক পাকিয়ে তোলা সহজসাধ্য নয়, তবু সে

চেপ্টা করলে তোমাকেই করতে হবে।

অসমান সম্পর্ক মানে?

সেটা মোটেই দুর্বোধ্য নয়। কোথায় তুমি আর কোথায় এই সামান্য একজন থার্ডপণ্ডিত।

থার্ডপণ্ডিতের পরিচয়টা সামান্য হতে পারে, কিন্তু মানুষ হিসেবে তুমি তো সামান্য নও। সবাই জানে, মানুষ হিসেবে তুমি একজন অসামান্য মানুষ। আদবে-চরিত্রে-চেহারা-জ্ঞানে তোমার জুটি মেলা ভার।

রেজা সাহেব স্মিত হাস্যে বললেন— দেখো ঐটুকু পুঁজিতে কাজ হয় কিনা চেপ্টা করে দেখতে পারো।

৯

ঐ পুঁজির উপর ভরসা করেই নূসরত জাহান নূরী মাঠে নেমে পড়লো। সোহাগীকে দিয়ে মামুজানকে এবং মামুজানকে দিয়ে আব্বা আলহাজ্জ ইসমাঈল হোসেন চৌধুরীকে ধরার চেপ্টা করলো সে। কিন্তু নূরীর আব্বা তখন বেশ কয়েকটি ভাল সম্পর্ক যোগাড় করে নিয়ে জোরদার কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছেন আর দর কষাকষিতে ব্যস্ত আছেন।

নূরীর মামুজান আহসান আলী মৃধা সাহেব প্রথম থেকেই থার্ডপণ্ডিত আমির রেজাকে বেশ পছন্দ করতেন। ঐ রটনার কারণে মাঝখানে যথেষ্ট রুষ্ট থাকলেও রটনাটা মিথ্যা প্রতিপন্ন হওয়ায়, রেজা সাহেবের উপর তিনি আরো বেশি প্রসন্ন হয়ে উঠেছেন। অকারণে রেজা সাহেবের উপর নারাজ হওয়ার প্রেক্ষিতে মৃধা সাহেব মনে মনে অপরাধবোধও করছেন। এই সময় সোহাগীর মুখে নূরীর ইচ্ছার কথা শুনে খুবই খুশি হলেন মৃধা সাহেব। উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। এমন ছেলে সত্যিই খুঁজে পাওয়া কঠিন—একথা মৃধা সাহেব বোঝতেন। নূরীর সাথে ছেলেটাকে বেজায় মানাবে—এটাও সময় সময় খুবই চিন্তা করে দেখতেন তিনি। কিন্তু এ যাবৎ তিনি মুখ খুলতে সাহস পাননি। সাহস পাননি নূরীর ভয়েই বেশি। রেজা সাহেবের তয়-তদবির যা-ই করুক, সে কলেজে পড়া মেয়ে। হাই স্কুলের সামান্য একজন থার্ডপণ্ডিতকে আদৌ যদি পছন্দ না করে নুরী!

সেই নূরীই আগ্রহী হয়ে কথা তুলেছে দেখে তিনি আর বিলম্ব করলেন না। চৌধুরী সাহেবের কাছে কথাটা তোলার সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। একদিন সন্ধ্যার পর রুগ্ণা পত্নীর কাছে বসে নূরীর শাদির ব্যাপারেই কথা বলছিলেন চৌধুরী সাহেব। মৃধা সাহেবকেও সেখানে ডেকে নিয়েছিলেন। টের পেয়ে নূরীও এসে দরজার আড়ালে দাঁড়ালো। কোন বর কত চায়, কার কি যোগ্যতা, যোগ্যতা অনুসারে কাকে কতো দেয়ার কথা বলা যায়—এসব পরামর্শই স্ত্রী আর শ্যালকের সাথে চৌধুরী সাহেব করছিলেন। এই কথাবার্তার এক ফাঁকে মৃধা সাহেব বললেন—আমি বলি কি দুলাভাই, এই সব ঝুটঝামেলার মধ্যে খামাখা

কেন যাচ্ছি আমরা? আলোর নিচেই অন্ধকারের মতো হাতের কাছে এতো ভাল বরটাকে আমরা কেন দেখতে পাচ্ছিনে?

মুখ তুলে চৌধুরী সাহেব বিস্মিতকণ্ঠে বললেন-হাতের কাছে বর! তুমি কার কথা বলছো?

মৃধা সাহেব বললেন-কেন, থার্ডপণ্ডিত ঐ আমির রেজা! দুটোতে কেমন মানাবে দেখেছেন?

বিস্ময় ও বিরক্তির সাথে কিছুক্ষণ নীরব থাকার পরে চৌধুরী সাহেব বললেন-তুমি কি খেপে গেলে মৃধা? কনের সাথে মানালেই বর ভাল হয়ে গেল? তার আর কোন দিক বা আর কোন গুণাগুণ দরকার নেই?

আরো অধিক উৎসাহিত হয়ে উঠে মৃধা সাহেব বললেন-গুণাগুণ? গুণাগুণ নেই মানে? রেজা মিয়ার যা গুণাগুণ, এর অর্ধেকটা গুণসম্পন্ন ছেলেও আজকাল খুঁজে পাওয়া যাবে নাকি? রেজা মিয়া যেমনই নয়, তেমনই ভদ্র। আদব-আখলাক-আচরণ, যাকে বলে একেবারে অতুলনীয়। ওদিকে আবার দেখুন, কেমন ইবাদতমুখী আর ঈমানদার ছেলে। এ বয়সের একটা লোকের মধ্যে এমন আল্লাহপ্রীতি আর আল্লাহভীতি কি ভুরি ভুরি পাওয়া যায়? এ দুনিয়ার সেরাগুণই তো ঐ আল্লাহপ্রীতি আর আল্লাহভীতি। এটা যার মধ্যে আছে, তার কি আর অন্য গুণের আদৌ দরকার আছে?

ক্লীষ্টহাসি হেসে চৌধুরী সাহেব বললেন-হঁ! তুমি এখনো ছেলে মানুষই রয়ে গেলে মৃধা। আবেগটা তোমার মধ্যে এখনো ঐ আগের মতোই আছে।

অর্থাৎ?

আবেগ দিয়ে জীবন চলে না মৃধা। আবেগ এক জিনিস আর বাস্তব জীবন আর এক জিনিস। অন্যান্য গুণের কিছুটা প্রয়োজন থাকলেও এ দুনিয়ায় অধিক প্রয়োজন অর্থনৈতিক সংগতি। সেদিকটা পুরোটাই এড়িয়ে যাচ্ছে কেন?

তার অর্থ? পণ্ডিতের আয় উপায় কম, সেই কথা বলছেন?

: অবশ্যই। আর সেইজন্যই এ প্রস্তাব এক কথায় খারিজ। এমন বিয়ে হতে পারে না কখনো।

www.boighar.com

কথা ধরলেন চৌধুরী সাহেবের রুগ্ণা পত্নী আশিয়া বেগম। বললেন- কেন হতে পারে না? এমন সুন্দর ছেলের সাথে হতে পারে না কেন? আমি বেশি বাইরে বেরুতে পারিনে ঠিকই। তবু এই শুয়ে-বসে থেকেই যা দেখছি আর শুনছি, তাতে তো এমন ছেলে আর হয় নাকি, সুন্দর তার আচরণ! ছোটবড় সবার সাথে কি অমায়িক তার ব্যবহার। ঝি-চাকর সবাই এই ছেলেটার তারিফ করে অহরহ। ওদিকে নূরীও আবার কেমন ভাই-বোনের মতো মিশে গেছে ছেলেটার সাথে। এমন ছেলে রেখে অচেনা-অজানা কার সাথে শাদি দেবেন মেয়ের, শনি?

বেগম!

সে ছেলে যদি গৌয়ার আর বদমেজাজি হয়? অসৎ মাতাল আর মদখোর হয়, তখন?

সংগে সংগে কথা ধরে মৃধা সাহেব বললেন—হ্যাঁ-হ্যাঁ দুলাভাই, বুবুজান বড় মারাত্মক প্রসঙ্গ তুলেছেন। আজকালকের লেখাপড়া জানা অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেরা এমনটি হতেই পারে। ঘর ছেড়ে বাইরে থাকার স্বভাব গজাতেই পারে তার মধ্যে। অথচ মেয়ের গায়ে কাঁটার আঁচড় লাগারও সম্ভাবনা নেই যেখানে, সেখানে ছাড়া কেন আমরা মেয়েকে যন্ত্রণার মধ্যে ফেলে দেবো?

চৌধুরী সাহেব বললেন— মেয়ের যন্ত্রণার মধ্যে পড়া-নাপড়া সবই মেয়ের নসীব আহসান আলী। নসীবে যদি যন্ত্রণাভোগ থাকে তার, আমরা শত চেষ্টা করেও তাকে যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করতে পারবো না।

দুলাভাই!

মেয়ের নসীবে সুখ হবে কি দুঃখ হবে—সবই অনিশ্চিত। ভবিষ্যতের ব্যাপার। সেই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবেই মেয়েকে আমরা জেনে শুনে একজন নিশ্চিত নিঃস্বের হাতে তুলে দেবো নাকি?

নিঃস্ব? রেজা মিয়াকে একজন নিঃস্ব লোক বলছেন?

বাস্তবমুখী হও মৃধা। দূরদৃষ্টিটা একেরারেই চাঙ্গ তুলে রেখো না। সামান্য একটা থার্ডপণ্ডিতের চাকরি করতে ঢাকা থেকে সে সুদূর এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে এসেছে। এই আসার পেছনে যুক্তি যতই থাক, এই বেতনের লোকের আর্থিক অবস্থা কখনো সম্বল হতে পারে না। দীনহীনই বলা চলে।

দুলাভাই!

ভাল মানুষ নিয়ে আমি করবো কি, বলো? মেয়ে যদি দুই বেলা দু'মুঠো খেতেই না পায়, ভাল মানুষ তখন কোন কাজে আসবে আমার? জন্মের পর থেকেই প্রাচুর্যের মধ্যে মানুষ হয়েছে নূরী। ওর ন্যূনতম চাহিদাগুলো তো পূরণ হওয়া চাই।

চৌধুরী সাহেবের অকাট্য যুক্তির মুখে মৃধা সাহেবরা দুই ভাইবোন আর কোন কথা বলতে পারলেন না। চৌধুরী সাহেব একটু থেমে ফের বললেন— ওসব আলগা খোয়াব ছেড়ে দিয়ে বাস্তবের দিকে এসো। যে সব সম্পর্ক হাতে এসেছে এখন এগুলোর মধ্যে কোনটাকে গ্রহণ করা যায়, সেইটেই ভেবেচিন্তে দেখো। প্রাণান্তেও একজন নিঃস্ব লোকের হাতে মেয়ে দেবো না আমি— এটা স্থির জেনে রাখো তোমরা।

অনেকটা নাখোশ হয়েই ওখান থেকে তখনকার মতো উঠে গেলেন চৌধুরী সাহেব। তাদের কোন কথাতেই কান দিলেন না আর।

কান দিলেন না আর তিনি কারো কথাতেই কখনো। চরম ধরপাকড় করা আর সমঝানো সত্ত্বেও চৌধুরী সাহেব অনড় থাকলেন তাঁর সিদ্ধান্তে। রেজা সাহেবের সাথে কন্যার শাদি তিনি কস্মিনকালেও দেবেন না—এই সিদ্ধান্ত থেকে

তাকে এক ইঞ্চিও নড়াতে কেউ পারলো না।

দেখে-শুনে একদম হতাশ হলো নূরী। রেজা সাহেবের সামনে এসে থপ করে বসে পড়ে বললো-এখন? এখন কি হবে?

রেজা সাহেব স্বাভাবিককণ্ঠে বললেন-কি হবে মানে? কিসের কি হবে?

সেকি! এখনো তুমি চোখ-কান বন্ধ করে বসে আছো? বাপজান যে আমাদের শ্যাদিতে কিছুতেই রাজি হচ্ছে না-এটা কি কিছুই জানতে পারোনি এখনও?

জানতে পারবো না কেন? সবই জানতে পেরেছি। রাজি যে তিনি হবেন না-সেটাও আগে থেকেই জানতাম।

কি রকম?

সেদিন তোমাকে বলেছিলাম না, ঐটুকু পুঁজিতে কাজ হয় কি না, চেষ্টা করে দেখতে পারো? আমি জানতাম, কাজ ওতে হবে না। আরো মোটা পুঁজি চাই।

অর্থাৎ?

আঙুলে টাকা বাজানোর ভঙ্গি করে রেজা সাহেব বললেন-তংকা-তংকা। প্রচুর তংকা ঘরে না দেখলে বড়লোকেরা শুধু রূপগুণ দেখেই মেয়ের বিয়ে দেয় না। “বাপ ভালো না ভাইয়া ভাইয়া, সবচে ভালো রূপাইয়া” এ গানটা তো শুনেছো? অন্য ক্ষেত্রে যা-ই হোক, এক্ষেত্রে এ গানের গুরুত্ব হান্ড্রেড পারসেন্ট। সম্পদ হয় তো সব হয়।

কিন্তু সম্পদটাই তো সব নয়। গোল্ড ইজ নট এভরি থিং”। আমার বাপজান কেন যে এই সত্যটা বুঝতে পারছেন না-এই দুঃখেই আমি জ্বলে-পুড়ে মরছি।

সম্পদ সব নয় তো, কি সব?

: ক্যারেকটার। ঐ যে আমরা পড়েছি-“অর্থ নাই তো কিছুটা নাই, স্বাস্থ্য নাই তো অনেকটা নাই, চরিত্র নাইতো কিছুই নাই”। মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ চরিত্র।

ক্লীষ্ট হাসি হেসে রেজা সাহেব বললেন-ওসব জ্ঞানে তোমার আমার পেট ভরতে পারে, হিসেবী লোকদের তা ভরে না। বিশেষ করে যারা বিত্তবান তাদের পেট কোনদিনই ভরতে দেখা যায়নি।

তাহলে এখন উপায় কি? তত্ত্ব কথা থাক। উপায় তো কিছু একটা ভেবে দেখতে হবে? উপায় কিছু দেখো।

কি উপায় দেখবো? যার মেয়ে তিনি যদি শাদি দিতে একদম নারাজ হন, তাহলে তো আর উপায় কিছু দেখিনে।

দেখিনে বললেই কি হবে? আঝা যেভাবে উঠেপড়ে লেগেছেন, তাতে কখন যে কাকে এনে হাজির করে বলেন-এই তোমার বর, একেই তোমাকে কবুল করতে হবে। তখন? তখন কি করবে?

তখন?

হ্যাঁ। আর উপায় কিছু দেখিনে বলে তখনও কি ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থেকে দেখবে- অন্যে এসে কিভাবে শাদি করে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে?

না-না সেটা তো আমি সহ্য করতে পারবো না।

তা যদি না পারো, উপায় একটা বের করো চিন্তা করে। আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা তামামই ব্যর্থ হতে দিও না।

রেজা সাহেব অসহায়ভাবে বললেন- কি করবো, কিছুই মাথায় আমার ধরছে না যে!

ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়। "Where there is a will, there is a way" আসলে সেই will মানে ইচ্ছা তোমার আছে তো?

আছে মানে! পুরোপুরি আছে। একশ'ভাগ আছে। আমি তো হাপিত্তেশ করে আছি।

তাহলে মাথায় ধরছে না কেন? উপায় তো শেষমেষ আছেই একটা।

বিদ্যুৎ-বেগে মাথা তুলে রেজা সাহেব বললেন-এঁয়া! আছে? কি সে উপায়? কোন পথই না পাওয়া গেলে, আমরা তো পালিয়ে যেতে পারি।

পালিয়ে?

হ্যাঁ পালিয়ে। চলো আমরা পালিয়ে যাই। আব্বা যখন কিছুতেই রাজি হচ্ছেন না, থাকুন উনি নারাজ হয়ে। চলো এখান থেকে জলদি জলদি পালিয়ে যাই আমরা।

সবিস্ময়ে চেয়ে থেকে রেজা সাহেব বললেন পালিয়ে যাবো? পালিয়ে কোথায় যাবো?

কেন, ঢাকাতে। ঢাকাতে গেলে আর ধরে কে, আমাদের খুঁজেই পাবে না? ঢাকাতে?

হ্যাঁ। ওখানে নাকি একটা বাড়ি আছে তোমার?

তা আছে। মাথা গোঁজার ঠাই একটা আছেই তো। কিন্তু.....।

তবু কিন্তু! উপায় যখন কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না, তখন আবার কিন্তু কেন? পালিয়ে যাওয়াটাই এখন আমাদের জন্যে সহজ আর একমাত্র পথ।

সেতো একটা মস্তবড় বদনামের কাজ। পালিয়ে গেলে লোকে বলবে কি?

নূরী ক্ষিপ্তকণ্ঠে বললো- লোকের বলাবলিটা কি ধুয়ে খাবো আমরা? জীবনটাই আমাদের যেখানে মিসমার হয়ে যাচ্ছে, যেখানে আমাদের জীবন-মরণ সমস্যা, সেখানে লোকের বলাবলিতে কি আসে যায় আমাদের? তাছাড়া আমরা ঢাকায় চলে গেলে এখানে কে কি বললো- তা তো কানেও আমাদের পড়বে না

রেজা সাহেব তবু ইতস্তত করে বললেন- তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু

এখানকার চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে, গিয়ে খাবো কি আমরা?

তাজ্জব! দুইজনই কম বেশি শিক্ষিত লোক আমরা। তুমি গ্র্যাজুয়েট। এইচএসসি পাস করেছি আমিও। ঢাকায় গিয়ে পেটের ভাতটা জোটাতে পারবো না আমরা? টিউশনি করলেও নাকি অনেক পয়সা সেখানে।

হ্যাঁ, সেখানে খরচও আছে অনেক।

অর্থাৎ?

যেমন আয়, তেমন ব্যয়।

তা হোক, পেটের খাওয়াটা তো চলবে কোন মতে? নাকি তাও চলবে না? চলবে-চলবে। পেট চালানো তেমন একটা সমস্যা হবে না।

তবে? তবে আর এত পেঁচাপেঁচি করছো কেন?

পেঁচাপেঁচি করছি মানে, তোমাকে বাজিয়ে নিচ্ছি।

বাজিয়ে নিচ্ছি কেমন?

আজীবন আরামে মানুষ হয়েছে তুমি। দুঃখ-কষ্ট সহিতে পারবে কিনা, এই আরামের কথা মনে করে ভবিষ্যতে অনুতাপ করবে কিনা—তা বাজিয়ে নিতে চাই। আমাকে পাওয়ার জন্যে এত কষ্ট সহিতে যদি সত্যি সত্যিই রাজি থাকো, তাহলে তোমাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে আমার কোনই আপত্তি নেই।

রাজি-রাজি। তোমার জন্যে আমি আগুনে ঝাঁপ দিতেও রাজি।

আবেগের মাথায় কিছু বলো না বা করো না। শান্তচিত্তে ভেবে দেখো আগে।

www.boighar.com

ভেবেছি। যথেষ্ট ভেবে দেখেই এ কথা বলছি।

: বেশ, এতটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যদি হও তুমি, তাহলে পালিয়েই যাবো শেষ পর্যন্ত। কোনই আপত্তি করবো না।

তাহলে তাই চলো। দু'একদিনের মধ্যেই বেরিয়ে পড়ি আমরা।

রেজা সাহেব শংকিতকণ্ঠে বললেন—সেকি! দুই একদিনের মধ্যেই? না-না, এতো আগেই কেন? এটা তো শেষ পদক্ষেপ আমাদের। তার আগে আরো কিছুদিন দেখি, শেষ পর্যন্ত কি হয়।

কী দেখবে? আরো কিছুদিন কি দেখবে?

: দেখি, তোমার আকাঙ্ক্ষা শেষ পর্যন্ত মত পরিবর্তন করেন কিনা। এখনও তো কেউ কেউ আমাদের জন্যে চেষ্টা করে যাচ্ছেনই। সহজ পথে কাজ হলে ঐ কঠিন পথে যাবো কেন?

নূসরত জাহান গম্ভীরকণ্ঠে বললো—এখনো তুমি ধারণা করো সহজ পথে কাজ হবে? এখনো মূর্খের স্বর্গেই বাস করছো তুমি? Living in the fool's paradise.

নূসরাত জাহান নূরী ধৈর্য হারিয়ে ফেললো। রেজা সাহেব সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—আহা, শেষ পর্যন্ত দেখতে দোষ কি? সবুরে নাকি মেওয়া ফলে।

আমাদের বেলাতেও তো তা ফলতে পারে।

তার আগে আগুন লেগে সবকিছু পুড়ে ছারখার হয়ে যেতেও পারে। এবং সেইটেই হবে নির্ঘাত। সময় থাকতে করণীয় না করলে, পরে পস্তানো ছাড়া আর কিছুই করার থাকবে না, বুঝেছো?

থাকবে-থাকবে। ঘরে আগুন লাগবে ভেবেই ঘর ছাড়বো কেন? আগুনটা আসলেই লাগে কিনা দেখি। সে সম্ভাবনা দেখলে আর দেরি করবো এক লহমা? বেরিয়ে পড়বো সঙ্গে সঙ্গে।

অবশেষে হাল ছেড়ে দিলো নূরী। হাল ছেড়ে দিয়ে শান্ত কণ্ঠে বললো-আর আমি পারিনে। যা ভাল বোঝো তাই তুমি করো। আমাকে ভাসিয়ে দিয়েই যদি সুখ পাও, তাই তুমি দিও। আর আমার বলার কিছু নেই।

কণ্ঠে জোর দিয়ে রেজা সাহেব বললেন-দেবো না দেবো না। কখনোই ভাসিয়ে দেবো না তোমাকে। তুমি বরং এখন নীরবে অপেক্ষা করতে থাকো। যা করার আমাকে তা নিশ্চিত্তে করতে দাও। আল্লাহ চাহেন তো দেখবে-মকসুদ আমাদের পূরণ হয়েছে পুরোপুরিই।

অগত্যা নূরী সেই অপেক্ষাতেই রইলো। এ অপেক্ষার ফল যে সুফল হবে না, যে কোন মুহূর্তেই ঘনিয়ে আসতে পারে বিপদ, তা জেনেও সে রেজা সাহেবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গেল না। বিরুদ্ধে গিয়েও কিছু করার তার ছিল না। তাই চুপ করে থেকে সে সবকিছু লক্ষ্য করতে লাগলো।

অবশেষে নূরীর সন্দেহই সত্যি হলো। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই হঠাৎ করে একদিন পরিস্থিতিটা তুঙ্গে উঠে গেল। দিন দুইয়েক চৌধুরী সাহেব বাড়িতে ছিলেন না। এরপর ফিরে এসেই বাড়ির সবাইকে ডেকে নিয়ে তিনি হাসতে হাসতে বললেন-নূরীর শাদিটা একদম পাকা করে এলাম। একদম চূড়ান্ত ইনশাআল্লাহ। এর আর এদিক ওদিক হবে না।

শুনে মৃধা সাহেব বললেন- পাকা করে এলেন কেমন? কোথায় পাকা করে এলেন?

চৌধুরী সাহেব দরাজকণ্ঠে বললেন এই গোমস্তাপুরে। আমাদের এই গোমস্তাপুরে। খাশা ঘর বর। ওহ! এমনটি যে আল্লাহ তায়ালা জুটিয়ে দেবেন তা আশাই করতে পারিনি!

গোমস্তাপুর কোথায়? কার ছেলে, কে বর?

ঐ তো ঐ মীর পরিবারের ছেলে। ঐ যে হাশেম মীর ছিলেন? জন্মের অবস্থাপন্ন লোক আর খুবই নামডাক -ঐ হাশেম মীরের নাভীই সেই বর। হাশেম মিয়া জীবিত নেই, তাঁর স্ত্রী জীবিত আছেন। হাশেম মিয়ার গোটা পরিবার এই গোমস্তাপুরেই আছে। শুধু তিন ছেলের এক ছেলে আরিফ মীর ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে সপরিবার ঢাকায় বসবাস করেন এখন। এই আরিফ মীরের ছেলে হানিফ মীর সেই বর। মীর হানিফ আলী।

সের্কি! সেই সুদূর ঢাকায় শাদি দেবেন মেয়ের?

আরে না-না। শাদি তো এই গোমস্তাপুরেই দিচ্ছি। কুটুম্বিতা-আত্মীয়তা সবই এই গোমস্তাপুরে চলবে। বরের বাপ ব্যবসার খাতিরে ঢাকায় থাকেন—এই যা।

আচ্ছা! তা বর কি করে? লেখাপড়া কতদূর।

ডাক্তার-ডাক্তার। এল এম এফ ডাক্তার।

মধ্য প্রাচ্যের কাতারে চাকরি করে। মোটা মাস মাইনে। চাকরির বাইরেও তার এত উপায় যে, বরের আর কিছু না থাকলেও চলে।

মৃধা সাহেব আরো বিস্মিত হয়ে বললেন—ওরে বাবা! সে তো আরো দূরে। একদম কাতার? মধ্যপ্রাচ্যে শাদি দেবেন মেয়ের?

চৌধুরী সাহেব খোশদীলে বললেন—আরে দূর! কী যে বলো? চাকরির খাতিরে দু'চার বছর কাতারে থাকবে বড় জোর। তহবিলটা মোটা হয়ে গেলেই সে চলে আসবে দেশে। বাপের ব্যবসায় প্রচুর আয়। চিরদিন কাতারে পড়ে থাকবে কোন দুঃখে? বর্তমানের মাইনেটা খুবই মোটা, তাই কিছুদিনের জন্যে ওখানে আছে।

হুঁ! তাহলে দাবিটা কত? কয় লাখ দিতে হবে বরকে?

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠে চৌধুরী সাহেব বললেন এক পয়সাও না - এক পয়সাও না। আসল মজাটা তো এখানেই। বরের মেয়ে পছন্দ হলেই একদম বিনি পয়সায় বিয়ে।

বিনি পয়সায়?

হ্যাঁ-হ্যাঁ, বিনি পয়সায়। তারা বলেন কি জানো? বরপণ তো একটা সামাজিক অপরাধ। ইসলামের নীতিবিরুদ্ধ কাজ।

মৃধা সাহেব বললেন— সে সব তো আমরাও জানি। কিন্তু অন্যেরা তা মানছে কই?

এঁরা মানছেন। পুরোপুরি মানছেন। গোমস্তাপুরে যারা আছেন তাদের সবারই আমার নূরীকে খুব পছন্দ। কলেজে পড়ার কালেই নূরীকে তারা সবাই দেখেছেন। বরের বাপও দেখেছেন। একদম সামনা সামনি।

কিভাবে?

: নূরীদের হোস্টেলের পাশেই ওদের এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের বাড়ি আছে। ঐ আত্মীয়ের বাড়িতে এক বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়েই তারা নূরীকে দেখেছেন। নূরীর এক বান্ধবী আর সহপাঠিনী 'ঐ' বাড়িরই মেয়ে। ঐ অনুষ্ঠানে নূরীরও দাওয়াত ছিল। নূরী আক্ৰ কর্তা মেয়ে। এমনিতে দেখতে পেতো না। ওর ঐ বান্ধবী কায়দা করে দেখিয়েছে আর দেখামাত্র পছন্দ হয়েছে তাদের সবার।

বলেন কি! তাহলে এতদিন তারা চুপ ছিলেন কেন?

ওদের এক আত্মীয়ের মেয়ের সাথেই শাদির পয়গাম আসে ঐ ঘটনার

পরেই। জোরদার কথাবার্তা শুরু হয়। ঐ আত্মীয়টা নাকি একেবারেই নাছোড়পিণ্ডে ছিলেন। এই এতদিনে ভেঙ্গে গেছে সে বিয়ে আর তারা এখন আমাদের নূরীকে চাচ্ছেন।

হুঁ! তা বর কবে মেয়ে দেখতে আসবে?

এসব কথাবার্তা হয়েছে কি?

হয়েছে হয়েছে। সব কথাই পাকা। তবে বর মেয়ে দেখতে আসতে পারছে না এখানে। নূরীকে ঢাকায় নিয়ে গিয়ে দেখাতে হবে—এই যা একটু সমস্যা।

মৃধা সাহেব ভীষণ তাজ্জব হয়ে বললেন—ঢাকায় নিয়ে গিয়ে দেখাতে হবে মানে?

চৌধুরী সাহেব বললেন—হ্যাঁ সেই কথাই হয়েছে। পনের দিনের ছুটি নিয়ে বর ঢাকায় এসেছে গত সপ্তাহে। তার ছুটি এখন শেষের দিকে। বরের আসার সময় নেই। তার নাকি এখনো কিছু জরুরি কাজ আছে ঢাকাতে। তাই এখনই মেয়ে নিয়ে আমাদের যেতে হবে ঢাকায়। বরের মেয়ে পছন্দ হলে অল্পদিনের মধ্যেই বর আবার ছুটি নিয়ে একদম গাঁয়ের বাড়িতে চলে আসবে। শাদি হবে এই গোমস্তাপুরেই। তোমরা সব তৈরি হয়ে নাও মৃধা। সত্বর ঢাকায় রওনা হতে হবে।

www.boighar.com

কিছুক্ষণ দম ধরে থাকার পর মৃধা সাহেব বললেন— তা মেয়ে নিয়ে গিয়ে ঢাকায় কোথায় উঠবো আমরা? আমাদের তো কোন আত্মীয়ের বাড়ি নেই সেখানে। মেয়ে নিয়ে সরাসরি বরের বাড়িতে গিয়ে ওঠাটা তো খুবই দৃষ্টিকটু হয়। এ ছাড়া বরের যদি মেয়ে পছন্দ না হয়, তাহলে সে আর এক দিকদারী!

চৌধুরী সাহেব বললেন—আরে না-না, তা উঠবো কেন? সে ব্যবস্থা তো নাচোল গিয়ে ঠিকঠাক করেই এলাম। থানার পাশে ঐ যে মুহাম্মদ খাঁ আছেন, তার ভাস্তে ইব্রাহিম খাঁ, মানে আমাদের ইব্রাহিম মিয়া, চাকরি করে ঢাকায়। বৌ-বাচ্চা নিয়ে সে ঢাকাতেই থাকে। বেশবড় বাসা। সেখানে গিয়ে উঠবো আমরা।

সেখানে?

: হ্যাঁ। খাঁ সাহেবরা আমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। ইব্রাহিম মিয়া কিছুদিন আমার বাড়িতেও ছিল। এখন আর যাতায়াত নেই—এই যা।

তা ইব্রাহিম মিয়াকে তো আমিও চিনি। কিন্তু আমরা যে সেখানে যাবো, সে কথা কি ইব্রাহিম মিয়া জানে?

জানানো হয়েছে। আজই থানা থেকে ইব্রাহিমের সাথে কথা বলছেন মুহাম্মদ খাঁ সাহেব নিজে। ইব্রাহিম মিয়া খুশি হয়ে যেতে বলেছে আমাদের।

তাজ্জব। আপনি যে একদম পথঘাট সব বেঁধে ফেলেছেন মিয়াভাই। তা ইব্রাহিমের বাসাটা আমরা চিনবো কী করে?

মুহাম্মদ সাহেব ইব্রাহিমের ঠিকানা দিয়েছেন। পরিষ্কার ঠিকানা। যে কোন আদনা লোক গিয়েও নাকি অনায়াসেই খুঁজে পাবে এ ঠিকানা। আমরা পাবো না কেন?

যদি না পাই?

একান্তই না পেলে বড় একটা হোটেলে গিয়ে উঠবো। ঢাকাতে তো শুনেছি আবাসিক হোটেলের কোন অভাব নেই।

দুলাভাই!

এত সুন্দর একটা সম্পর্ক পাওয়া গেছে যখন, কিছুটা তকলিফ তো করতেই হবে মৃধা। ঝুঁকি কিছু নিতেই হবে জরুর। আর কথা না বাড়িয়ে সেই মতো সবাই তোমরা তৈরি হও গে যাও। খুব বেশি দেরিতে হলেও আগামীপরশুই বেরিয়ে পড়তে হবে আমাদের। তাহলেও দুই তিনদিন সময় হাতে পাবো আমরা

১০

ঐ দিনই একটু পরে চৌধুরী সাহেব ফের মৃধা সাহেবকে ডেকে নিয়ে বললেন—একটা কাজ করলে কেমন হয় মৃধা? আমাদের এই পণ্ডিত রেজা মিয়ার বাড়ি তো ঢাকা শহরেই। তাকে সাথে নিলে কেমন হয়?

বিস্মিত নয়নে চেয়ে মৃধা সাহেব বললেন—তাকে সাথে নেবেন কেমন?

কথা হলো, যতই বলি, একেবারেই অচেনা অজানা জায়গা। ঢাকায় কেউ আমরা যাইনি। ইব্রাহিমের ঠিকানাটা না চিনতে পারি যদি? হোটেল টোটেল খুঁজে নেয়াও একটা বিরাট সমস্যা। ঢাকায় বসবাসকারী একজন কেউ সাথে থাকলে কাজটা আমাদের সহজ হয়ে যায় না কি?

তা যায় বটে। কিন্তু রেজা মিয়াকে সাথে নেয়া কি ঠিক হবে? তাছাড়া, সেই প্রস্তাবটাই বা তাকে দেয়া যায় কি করে? নূরীর শাদিটা তার সাথে দেয়া গেল না যেখানে—

: তাতে কি হয়েছে? এতদিন ধরে সে এ বাড়িতে আছে, নুন খাচ্ছে এ বাড়ির, আর প্রয়োজনের সময় এ উপকারটুকু করবে না? কাজটা তো এমন কিছু কঠিন কাজ নয়, সাথে যাবে শুধু আর ইব্রাহিমের বাড়িটা খুঁজে দেবে, ব্যস! তার কাজ শেষ। হয় সে ফিরে আসবে তখনই, নয় দু'একদিন তার নিজের বাড়িতে কাটিয়ে আসবে।

তাতো বুঝলাম। কিন্তু আমি বলছি—তার সাথে নূরীর শাদিটা আমরা দিতে পারলাম না যখন—

: কেন দিতে পারলাম না, সে কথা কি রেজা মিয়া বুঝে না? তার মত একজন শিক্ষিত আর জ্ঞানী ছেলে এ কথাটা কেন বুঝবে না যে, একজন বিত্তবান ঘরের মেয়েকে বিত্তহীনের সাথে শাদি দিতে কোন বাপই পারে না? শাদি দেয়া যায়নি বলেই কি আমরা তার দুশমন বনে গেছি? না, সে আমাদের দুশমন বনে গেছে?

দুলা ভাই!

কথাটা তার কাছে তুলেই দেখো না। যদি সে বেশি কাঁচুমাচু করে, তাহলে দরকার নেই। নবাবগঞ্জ থেকে কাউকে যোগাড় করে নেবো, নয় নিজেরাই আমরা যাবো। কথাটা তাকে একবার বলেই দেখো না, সে কি জবাব দেয়।

হ্যাঁ, তা বলে দেখা যেতে পারে।

তাই দেখো। এমনিতেই তাকে এ বাড়িতে রাখা আর ঠিক হবে না। স্কুলের বোর্ডিং হাউসে বা অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিতে হবে। এর উপর এ ব্যাপারে যদি সে বেশি বাড়াবাড়ি করে, তাহলে এখনই তাকে এ বাড়ি থেকে সরিয়ে দিয়ে তবেই আমরা ঢাকা যাবো। এইটুকু উপকার করবে না সে?

চৌধুরী সাহেব ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছিলেন। মৃধা সাহেব বাধা দিয়ে বললেন— সে কি! না- না, বাড়াবাড়ি করবে এমন ছেলেই সে নয়। আমার বিশ্বাস সে রাজি হবে। এক কথায় রাজি হবে। আপনি খামাখা অস্থির না হয়ে ইব্রাহিম মিয়ার ঠিকানাটা দিন আমাদের। রেজা মিয়ার সাথে এখনই কথা বলবো আমি।

চৌধুরী সাহেব পকেট থেকে ঠিকানা লেখা কাগজটা বের করে মৃধা সাহেবকে দিলেন। ঠিকানা নিয়ে মৃধা সাহেব এক পা দু'পা করে এসে রেজা সাহেবের ঘরে ঢুকলেন।

তাকে দেখে রেজা সাহেব ব্যস্ত হয়ে উঠতেই মৃধা সাহেব বললেন—আরে বসো-বসো তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে।

এই বলেই মৃধা সাহেব তার পাশে বসলেন এবং ফের বললেন— কথা মানে, আমাদের নূরীর একটা শাদির সম্পর্ক এসেছে ঢাকা থেকে— এ ব্যাপারে কি কিছু শুনেছো?

রেজা সাহেব হাসিমুখে বললেন—জি, এই— এখনই শুনলাম। আপনার ভাগ্নে রকিবুল হাসান আর গরীবুল্লাহ মিয়ার মুখে মোটামুটি সবই আমি শুনলাম।

ও আচ্ছা। আমি সব কথা আরো ক্লিয়ার করে বলছি, শোনো—

এই বলে ঘটনাটা তিনি আগাগোড়া ব্যাখ্যা করে রেজা সাহেবকে শোনালেন। এরপরে বললেন—ঐ ইব্রাহিম মিয়ার বাড়িটা চিনিয়ে দেয়ার জন্যে তোমাকে সাথে নেয়ার চিন্তাভাবনা করছি আমরা। তোমার কি তাতে অসুবিধে হবে?

রেজা সাহেব সাগ্রহে বললেন— না-না, অসুবিধে কি? আরে এতদিন যাযাও আপনাদের বাড়িতে আছি, আর আপনাদের এই উপকারটুকু করবো না?

: তা তুমি নিশ্চয়ই করবে, এ বিশ্বাস আমার আছে। কিন্তু তোমার সাথে নূরীর শাদিটা দিতে আমরা পারলাম না। এ অবস্থায় তুমি কতখানি আগ্রহ দেখাবে এ কাজে—এ নিয়ে আমরা একটু ইতস্ততের মধ্যে আছি।

সেকি! ইতস্ততের মধ্যে থাকবেন কেন? নূরীর শাদিটা কেন যে আপনারা আমার সাথে দিতে পারলেন না, তা কি আমি বুঝিনে? আপনারা কি আমাকে কম ভালবাসেন? কিন্তু এমন অসমান শাদি আপনারা কেন, কেউ দিতে পারে

না। এ নিয়ে আমি নারাজ বা নাখোশ হবো কেন? ওটা আপনারা মোটেই মনে করবেন না। কবে যেতে হবে বলুন, আমি রাজি।

খ্যাংক ইউ-খ্যাংক ইউ! এমনিটাই তোমার কাছে আশা করেছি আমি। এবার দেখো তো, এই ঠিকানাটা চিনতে পারো কিনা মানে এই এলাকাটা? ঐ ইব্রাহিম মিয়া এখানে বাস করে।

বলতে বলতে ঐ ঠিকানা লেখা কাগজটা তিনি রেজা সাহেবের হাতে দিলেন। কাগজটায় চোখ বুলিয়ে একটু খেমে গেলেন রেজা সাহেব। এর পরেই হেসে উঠে বললেন— আরে এতো আমার খুব চেনা এলাকা। একদম পরিচিত জায়গা।

এই নম্বরের বাড়িটা বের করতে পারবে ওখানে গিয়ে?

রেজা সাহেব জোর দিয়ে বললেন—এক নিমিষে—এক নিমিষে। বললামই তো, খুবই চেনা জায়গা আমার। কবে যেতে হবে বলুন?

আগামীকাল সব গুছিয়ে নিয়ে আগামীপরশু খুব সকালেই।

ও কে আমি রেডি। এর মধ্যেই স্কুল থেকে ছুটিটা নিয়ে নেবো। আপনারা বেরগলেই, আমিও বেরবো।

ভেরিগুড—ভেরিগুড।

হাসতে হাসতে চলে গেলেন মৃধা সাহেব। অন্দরে এসেই রেজা সাহেবের সম্মতির কথাটা সবাইকে জানিয়ে দিলেন বড় গলায়।

পর পর আচমকা ধাক্কায় নূসরাত জাহান নূরী দিশেহারা হয়ে গেল। হঠাৎ এই শাদির খবরটা সামাল দিতে না দিতেই, রেজা সাহেব নিজে এবং সাগ্রহে তাদের নিয়ে ঢাকায় যাবে এ খবরটা শুনে, নূরী উম্মাদিনী হয়ে গেল। সহ্য করতে না পেরে সবার অলক্ষ্যে সে ছুটে এলো রেজা সাহেবের কাছে। আড়ালে ডেকে নিয়েই নূরী রেজা সাহেবকে আক্রমণ করে বসলো— এখন? এখন মজাটা কেমন বুঝছে? এত করে বললাম, সময় থাকতে চলো পালাই। কিন্তু শুনলে না এখন খুব খুশি হয়েছে তো!

রেজা সাহেব হাসিমুখে বললেন—হ্যাঁ, খুব খুশি হয়েছে। আল্লাহ যা করেন, ভালর জন্যেই করেন।

শুনে স্তম্ভিত হলো নূরী। রেজা সাহেবকে হাসতে দেখে মাথায় তার আগুন ধরে গেল। সে আরো ক্ষিপ্তকণ্ঠে বললো—তাই বুঝি সেই ভালোটাকে আরো ভাল করতে আমাদের সাথে ঢাকায় যাবে তুমি? বিশ্বাসঘাতক! বেইমান! আমার অভিভাবকদের সাথে বেমালুম হাত মিলিয়ে ফেললে? কিন্তু জেনে রাখো, তুমি যখন বেইমানি করলে, এ জীবনে আর শাদিই করবো না আমি। ঢাকায় নিয়ে যাক, আর যেখানেই নিয়ে যাক, কারো সাধ্য নেই যে আমাকে শাদি দেয় কারো সাথে।

ক্রোধে ফুঁসতে লাগলো নূরী। রেজা সাহেব তাকে থামাতে থামাতে বললেন—

ওরে অবুঝ, আমি যা বলি তা শুনো আর বোঝার চেষ্টা করো। ঢাকায় আমরা পালিয়ে যাবো—এই কথা ছিল তো? এত সহজে যে সেই সুযোগটা আসবে, তা কি ভাবতে পেরেছি কখনো? সবই ঐ রহমানুর রহীমের ইচ্ছা।

থমকে গিয়ে নূরী বললো—এঁয়া, কি বললে? সুযোগ এলো মানে?

এলো না? আমাদের গোপনে ঢাকায় যেতে হতো। কত অসুবিধে হতো তাতে। এখন প্রকাশ্যে আর আরামে ঢাকায় পৌঁছতে পারছি আমরা। ঢাকায় গিয়ে যদি এক ফাঁকে কেটে পড়ি আমরা আর ঢাকার অন্য এক এলাকায় গিয়ে গা ঢাকা দিই, তাহলে কি তোমার অভিভাবকদের সাধ্য হবে আমাদের খুঁজে বের করার?

www.boighar.com

নূরীর চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সে শান্তকণ্ঠে বললো—হ্যাঁ -হ্যাঁ তাইতো! তাও তো হতে পারে।

: হতে পারে নয়, তাই করা হবে। এরপর সাবালিকা মেয়ে তুমি। কাজীর অফিসে গিয়ে যদি বিয়েটা আমাদের রেজিস্ট্রি করে ফেলি আর কলেমাটাও সেরে নিই সেখানে, তাহলে কি আর সমস্যা থাকবে কিছু? সবশেষে আমাদের শাদির কথাটা তোমার অভিভাবকদের পত্রযোগে জানিয়ে দিয়ে আমরা আমার ঢাকার বাড়িতে এসে উঠলে, ব্যস! তামাম ঝামেলা খতম। আর কারো কিছুই করার থাকবে না আমাদের বিরুদ্ধে।

নূরী এবার উৎফুল্লকণ্ঠে বললো— ওম্মা! মনে মনে তুমি এই বুদ্ধি এঁটে নিয়ে আছো?

তবে কি সাধেই আমি হাসছি? তুমি কোনই ঝামেলা করবে না আর। নীরবে সবার সাথে যাবে আর আমি যখন যা করতে বলি তাই করবে, বুঝেছো?

যারপর খুশি হয়ে নূরী বললো—বুঝেছি-বুঝেছি। আর বলতে হবে না। বাপরে বাপ! কী তোমার বুদ্ধি। পণ্ডিতিতে তুমি থার্ড হলে কি হবে, বুদ্ধিতে একদম ফার্স্ট।

হাসতে লাগলো নূরী। রেজা সাহেব বললেন—এখন যাও এখান থেকে। কেউ দেখে ফেলবে।

খুশিতে ডগমগ হয়ে দ্রুতপদে সেখান থেকে চলে এলো নূরী।

নির্ধারিত দিনেই রওনা দিয়ে যথা সময়ে সবাই পৌঁছে গেলেন ঢাকায়। সবাই মানে চৌধুরী সাহেব, মুধা সাহেব, নূরী আমির রেজা এবং মালপত্র টানাটানি করার জন্যে কিষান গরীবুল্লাহ। ঢাকায় এসে বাস থেকে নামার পর এই দলের গাইড হলেন রেজা সাহেব। তিনিই এখন সবাইকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলতে লাগলেন। বাস থেকে নেমে একটা প্রাইভেটকার (ট্যাক্সি) ভাড়া করলেন রেজা সাহেব এবং সেই কারে চড়ে সবাই ইব্রাহিম মিয়ান ঠিকানার দিকে চললেন।

কার এসে অবশেষে এক অভিজাত গৃহের সংরক্ষিত গেটে থামলো। এক সুরম্য অট্টালিকা। অট্টালিকাটি এতই সুন্দর আর শৌখিন যে, অভিজাত লোকের অভিজাত প্রাসাদ বললেও ভুল হয় না। সেই প্রাসাদের সামনে একটি মস্তবড় লন। অর্থাৎ ঘাসে ঢাকা একটি প্রশস্ত অঙ্গন। অঙ্গনটির ঠিক মাঝখানে সুন্দর এক গোলাকার ফুল বাগান। ফুল বাগানের চারপাশে সিমেন্টের কয়েকটি বসার আসন। ঐ সুরম্য অট্টালিকা ও লনসহ গোটা বাড়িটা সুউচ্চ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। প্রাচীরটার কোল ঘেঁষে ও লনের চার পাশে ছোট বড় আরো অনেক রং-বেরঙের ফুলের গাছ। সদর রাস্তার পাশে এই বাড়ির মেইন গেট। লনের ডান দিকে ও বাঁ দিকে প্রাচীরের গায়ে আরো দুটো গেট আছে ছোট ছোট। এগুলো প্রাইভেট গেট এবং বন্ধ থাকে অধিক সময়। মেইন গেটের এক পাশে ছোট একটি দালান ঘর। এখানে গেটকিপার বাস করে।

গেটে গাড়ির হর্ন বাজতেই ছুটে এলো গেটকিপার উজির আলী। গেট খুলে দিয়ে সে চেয়ে রইলো গাড়ির দিকে। গাড়ির ভেতর থেকে রেজা সাহেব সবাইকে বললেন—নামুন, আমরা এসে গেছি, নামুন সবাই।

সবাই নেমে পড়লেন। ড্রাইভারের ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে রেজা সাহেব ঘুরে দাঁড়ালে তাকে দেখেই উজির আলী চিৎকার দিয়ে বলে উঠলো—এ্যা, একি!—একি!

বলেই সে ভেতরের দিকে এগিয়ে গিয়ে হাঁকতে লাগলো—হাকিম ভাই, আরে ও সেলিম মিয়া—শিগগির এদিকে আসুন সবাই। দেখুন কে এসেছে, মানে কারা এসেছে—শিগগির এসে দেখুন—

উজির আলী হাঁকতে লাগলো। গেটের দিকে ইশারা করে রেজা সাহেব বললেন—আসুন, এখানেই ইব্রাহিম মিয়া থাকেন।

গেট পেরিয়ে সামান্য একটু ভেতরে এসেই থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন সবাই। চারদিকে চেয়ে দেখে চৌধুরী সাহেব শংকিতকণ্ঠে বললেন—ইব্রাহিম এখানে থাকে মানে? এটা তো দেখছি কোন এক সাহেব সুবার বাড়ি। জজ-ম্যাজিস্ট্রেট-লাট বাহাদুরের বাড়ি! এ তুমি আমাদের কোথায় নিয়ে এলে?

রেজা সাহেব বললেন—চিন্তা করার কিছু নেই। আপনার ঠিক জায়গাতেই এসেছেন।

এবার মৃধা সাহেব ক্ষিপ্তকণ্ঠে বললেন—ঠিক জায়গা। প্রতারক, তুমি আমাদের সাথে প্রতারণা করছো? তিন পয়সা মাইনে পায় ইব্রাহিম মিয়া। সে এই রাজবাড়িতে থাকে নাকি? চলুন দুলাভাই, বেরিয়ে পড়ি শিগগির। আমরা প্রতারণায় পড়েছি। বিপদের গন্ধ শুঁকে পাচ্ছি। www.boighar.com

রেজা সাহেব দৌড়ে এসে পথ আগলে দাঁড়ালেন এবং দুইহাত জোড় করে বললেন—দোহাই আপনাদের। আপনারা আমাকে ভুল বুঝবেন না। আর না এগোন, এখানে দাঁড়ান। আমি এখনই ইব্রাহিম মিয়াকে ডেকে দিচ্ছি।

ইতোমধ্যে পিয়ন সেলিম ও কেয়ারটেকার আব্দুল হাকিম নিকটে এসে গিয়েছিলে। “স্যার এসেছেন-স্যার এসেছেন” বলে সবাই হল্লা জুড়ে দিয়েছিল। হাত তুলে তাদের থামিয়ে দিয়ে রেজা সাহেব বললেন—

সেলিম, একদৌড়ে গিয়ে ইব্রাহিম মিয়াকে ডেকে আনো। গিয়ে বলো, নাচোল থেকে যাদের আসার কথা, তাঁরা এসে গেছেন আর আমাদের লনে দাঁড়িয়ে আছেন শিগগির আসুন।”

পিয়ন সেলিমউদ্দীন সংগে সংগে দৌড় দিলো। রেজা সাহেব এবার কেয়ারটেকারকে বললেন—হাকিম মিয়া, এঁরা আমাদের গেস্ট। এখানেই এঁরা থাকবেন। এঁদের নিয়ে গিয়ে আপাতত ড্রয়িং রুমে বসান আর এঁদের খাওয়া-থাকার সুব্যবস্থা করুন। কোন রকম ত্রুটি যেন না হয়।

“জি-আচ্ছা স্যার, জি-আচ্ছা স্যার,” বলে কেয়ারটেকার চৌধুরী সাহেবদের বললেন—আসুন হুজুর, সবাই আপনারা সামনের ঐ ড্রয়িংরুমে এসে বসুন—

চৌধুরী সাহেব রুটকণ্ঠে বললেন—না। ইব্রাহিম মিয়া কই ইব্রাহিম মিয়া? তাকে না দেখলে আর এক কদমও আমরা সামনে এগুবো না।

ইতোমধ্যেই প্রাচীরের গায়ের ডাইনের গেট দিয়ে লনে ঢুকে দৌড়াতে দৌড়াতে আসতে লাগলেন ইব্রাহিম মিয়া। অর্থাৎ চৌধুরী সাহেবদের দেশের সেই ইব্রাহিম খাঁ। তিনি কাছে এসেই সালাম দিয়ে বললেন—একি চাচা মিয়া, আপনারা এসে গেছেন? তা এখানে কেন? ঐযে প্রাচীরের ওপারে ঐ বিল্ডিং, ওখানে আমি থাকি।

সকলের দেহে প্রাণ ফিরে এলো। সালামের জবাব দিয়ে মৃধা সাহেব বললেন—তাকি আমরা চিনি। এই লোকই তো এখানে নিয়ে এলো আমাদের।

বলেই তিনি রেজা সাহেবের প্রতি ইংগিত করলেন। রেজা সাহেবের দিকে তাকিয়েই বিশ্বয়ে লাফিয়ে উঠলেন ইব্রাহিম মিয়া। বললেন—একি, স্যার আপনি! আপনিও এসে গেছেন? কিন্তু কি আশ্চর্য, আপনি এঁদের সাথে! ঘটনা কি স্যার?

রেজা সাহেব বললেন—ঘটনাটা এদের মুখেই শুনে নিন। এখনই আমাকে উপরে যেতে হবে। উপরের চাবি আমার কাছে।

ইব্রাহিম মিয়া কেবলই “কী আশ্চর্য ! কী আশ্চর্য!” বলে হাত-পা ছুড়তে লাগলেন। রেজা সাহেব ফের তাকে বললেন—এঁরা কিন্তু আমার গেস্ট খাঁ সাহেব। এঁরা আমার বাড়িতেই থাকবেন আর আমার বাড়িতেই খাবেন। সেই মোতাবেক আমার পিয়ন বাবুর্চিদের আপনিও একটু সাহায্য করুন।

—বলেই আবার চৌধুরী সাহেবদের তিনি হাসিমুখে বললেন—আর তো কোন সংশয় নেই আপনারদের। এবার মেহেরবানি করে এসে ড্রয়িং রুমে বসুন। আমি উপরে গিয়েই আবার নেমে আসছি এখনই—

রেজা সাহেব দ্রুতপদে চলে গেলেন এবং গিয়ে উপর তলায় উঠলেন। নাচোল থেকে আগত বাদবাকি সবাই তখন বিপুল বিশ্বয়ে মুহ্যমান। চৌধুরী

সাহেব কস্পিতকণ্ঠে ইব্রাহিম মিয়াকে প্রশ্ন করলেন— ওকে চেনো তুমি? ঐ যে উপরে যাচ্ছে ঐ লোককে?

www.boighar.com

আনন্দে বিস্ময়ে বিহ্বল ইব্রাহিম মিয়া বললো—সেকি! চিনবো না কেন? উনিই তো এই বাসার মালিক আমি যে বাসায় থাকি, মানে ঐ যে পূর্বদিকে প্রাচীরের ওপারে আর পশ্চিম দিকে প্রাচীরের ওপারে যে বাসাগুলো দেখছেন—সেগুলোও সব ইনারই বাসা। আমি ঐ পূর্বেরটায় থাকি।

মৃধা সাহেব ঢোক চিপে বললেন—সেকি! বলো কি? তাহলে কে এই লোক? কি এর পরিচয়?

আরে বাবা, এই লোককে চিনলেন না? যিনি আপনাদের এত সমাদরে মেহমান বানিয়ে নিচ্ছেন, তাকে চেনেন না? ইনি একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক। ঔপন্যাসিক আমির রেজা সাহেব। পড়েননি এঁর বই। সারা দেশের লোক এঁকে এক ডাকে চেনে। আপনারা নাম শুনেনি এর?

মৃধা সাহেব রুদ্ধকণ্ঠে বললেন— হ্যাঁ-হ্যাঁ শুনেছি। বইও তো এই নামের পড়েছি খান দুইয়েক। মানে, ঐ খান দুয়েকই হাতের কাছে পেয়েছি। কি চমৎকার লেখা! ইনিই তাহলে সেই ঔপন্যাসিক। ইনিই সেই আমির রেজা সাহেব ?

ইব্রাহিম মিয়া বললেন—জি,জি- ইনিই। মস্তবড় লোক ইনি। ঔপন্যাসিক হিসেবে তো বটেই, অর্থনৈতিক দিক দিয়েও মস্তবড় মানুষ উনি। এই এলাকার অন্যতম ধনাঢ্য লোক। লাখ লাখ টাকার ব্যাংক ব্যালাস রেখে গেছেন বাপে। এর সাথে ঐ সব বাড়ি থেকে মোটা ভাড়া পান মাসে। সবার উপরে আছে লেখার টাকা। হাজার হাজার টাকা পান বই থেকে। উনার নতুন বই বেরুলে সাথে সাথে ফুরিয়ে যায় সব কপি।

বিস্ময়ে অতলে তলিয়ে গিয়ে নির্বাক হয়ে রইলেন চৌধুরী সাহেব, মৃধা সাহেব ও গরীবুল্লাহ। নূরীর অবস্থা তখন বর্ণনার অতীত। প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থা তখন তার। এদের সবাইকে নির্বাক আর সবার চোখ মুখ বিবর্ণ দেখে ইব্রাহিম মিয়া বললেন—ও হো আপনাদের বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছে। বহুতদূর থেকে এসেছেন! আসুন-আসুন, ঐ ড্রয়িং রুমে গিয়ে আগে পাখার নিচে বসুন। পরে অন্য কথা। আসুন—আসুন—

ইব্রাহিম মিয়ার তাকিদে মন্ত্রমুগ্ধের মতো সবাই তাঁর পিছে পিছে এসে ড্রয়িং রুমে বসলেন। হতবুদ্ধি হয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকার পর মৃধা সাহেব বিহ্বলকণ্ঠে বলে উঠলেন—এ কি হলো দুলাভাই! আমরা কি সবাই স্বপ্ন দেখছি নাকি?

তাদের অবস্থা দেখে ইব্রাহিম মিয়াও বিপুল বিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন—কি ব্যাপার চাচা মিয়া? স্বপ্ন দেখার মতোই যে মনে হচ্ছে আমারও। এই লোকের সাথে আপনাদের পরিচয় হলো কি করে? ইনি কেন তাঁর বাড়িতে নিয়ে এলেন আপনাদের—আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনে।

মৃধা সাহেব এবার ধীরে ধীরে তামাম ঘটনা বর্ণনা করে শুনালেন। গাড়ির মধ্যে প্রথম দিনের অসুস্থ অবস্থা থেকে এই শেষ দিন পর্যন্ত যা যা ঘটেছে, সব কথা অতি সংক্ষেপে বলে গেলেন। এরপরে বললেন—ইনি আমাদের গ্রামের হাই স্কুলের থার্ডপণ্ডিত। আমার এই দুলাভাইয়ের বাড়িতেই থাকেন। অথচ এসব কি এখন দেখছি আর কি শুনছি! এমন অবস্থাপন্ন আর এমন পর্যায়ে লোক যিনি, তিনি ঐ গৈ-গ্রামে গিয়ে একটা থার্ডপণ্ডিতের চাকরি নেবেন কেন?

রেজা সাহেব বাড়িতে এসেছেন শুনে ইতোমধ্যেই তাঁর অনেক ভক্ত ও সুহৃদ তাঁর সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। এদের মধ্যে রেজা সাহেবের সাহিত্য সংক্রান্ত সুহৃদ আবদুস সালামও ছিলেন। মৃধা সাহেবের এ কথার জবাবে আবদুস সালাম সাহেব বললেন— কেন নিলেন, তা আমি বলছি। উনি ওখানে চাকরি করতে যাননি। উনি গেছেন সাঁওতালদের নিয়ে উপন্যাস লেখার মাল-মশলা যোগাড় করতে। সাঁওতালদের সাথে সরাসরি মিশে তাদের জীবন যাত্রা, আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি—সব কিছু নিজের চোখে দেখে নিয়ে উপন্যাস লিখবেন বলে ওখানে গিয়েছিলেন। একটা কিছু কাজ নিয়ে থাকতে হয় বলে ঐ থার্ডপণ্ডিতের চাকরি নিয়ে সেখানে ছিলেন উনি। আপনাদের জেলা শিক্ষা অফিসার উনার দূর সম্পর্কের ভগ্নিপতি। উনিই তাঁকে সাহায্য করেন এ কাজে। সে উপন্যাসটা লেখাও প্রায় শেষ করে ফেলেছেন। শুধু যনবিকাটুকু বাদে পাণ্ডুলিপিটা গোটাই আমাদের হাতে এসে গেছে। www.boighar.com

চৌধুরী সাহেব বিস্মিতকণ্ঠে বললেন—বলেন কি! সাঁওতালদের জীবন নিয়ে উপন্যাস লিখতে গিয়েছিলেন? তাজ্জব!

মৃধা সাহেব অস্ফুটকণ্ঠে বললেন—তাইতো উনি ঘন ঘন সাঁওতালদের পাড়ায় যেতেন দুলাভাই!

এরপর তিনি আবদুস সালাম সাহেবকে প্রশ্ন করলেন—আপনি কে? আপনি এসব জানলেন কি করে?

আবদুস সালাম সাহেব বললেন—আমি উনার বন্ধুই বলতে পারেন। আমার নাম মোঃ আবদুস সালাম। যে প্রকাশনী উনার বই বের করে, আমি সেই প্রকাশনীতে চাকরি করি।

ও আচ্ছা। তা এটা কি করে সম্ভব বলুন তো। এতবড় একজন মানুষ শুধু এই জন্যেই এতো দূরে গিয়ে অত কষ্ট করে পড়ে রইলেন?

হ্যাঁ, এটা একটা প্রশ্ন করার কথাই বটে। উনি ওখানে গিয়ে ছিলেন কিছুটা খেয়ালে আর অধিকটাই অনুরোধে টেকি গিলে।

সালাম সাহেব হাসতে লাগলেন। মৃধা সাহেব ফের প্রশ্ন করলেন—অনুরোধে টেকি গিলে কেমন? কার অনুরোধে?

উনার ঐ প্রকাশকের অনুরোধে। প্রকাশক সাহেব শুধু প্রকাশকই নন, রেজা সাহেবের একজন মুরগিবও বটে। প্রথম শুভাকাজক্ষী। ঐ প্রকাশক সাহেবের

অনুরোধে ওখানে অবশ্য উনি গিয়েছিলেন। অবশ্য প্রচুর অর্থের বিনিময়েও বটে। প্রকাশকের কথা— বেদে, জেলে, সাপুড়ে প্রভৃতি উপজাতিদের নিয়ে যিনিই যে উপন্যাস বা নাটক লিখেছেন, তা প্রত্যেকটিই বিরাট বাজার পেয়েছে। সমাদৃতও হয়েছে সর্বমহলে। সাঁওতালদের নিয়ে উপন্যাস লিখলে, বিশেষ করে, রেজা সাহেবের মতো ঔপন্যাসিকের হাত দিয়ে তা লিখা হলে এ উপন্যাসও বাজার পাবে ভীষণ এবং সর্বমহলে আদৃতও হবে এ বিশ্বাস প্রকাশক সাহেবের অত্যন্ত দৃঢ়। তাই, যতটা না টাকার কারণে, তার চেয়ে দশগুণে অধিক প্রকাশকের অনুরোধের কারণে এই কাজে সম্মত হন রেজা সাহেব।

বলেন কি!

তা ছাড়া রেজা সাহেবের এটা একটা খেয়ালও বটে। জন্মাবধি এই ঢাকাতাই আছেন। তাই কিছুদিন গৈ-গাঁয়ে গিয়ে থাকার একটা শখও তাঁর ছিল। তাই তাঁর এই রথ দেখা আর কলা বেচা।

সালাম সাহেব হাসতে লাগলেন। শ্রোতারা সবাই একসাথে বলে উঠলেন—কী তাজ্জব—কী তাজ্জব!

একটু থেমে মৃধা সাহেব চৌধুরী সাহেবকে কানে কানে বললেন—আর কি অন্য বর দেখার দরকার আছে দুলাভাই?

বিপুল আবেগে চৌধুরী সাহেব সশব্দে বলে উঠলেন ওরে না-না, কখনো না-কখনো না। হাতে পেয়ে অমূল্য মানিক আমরা কেমন পায়ে ঠেলেছিলামরে মৃধা!

এরপর সবাই খেয়াল করে দেখলেন, নূরী সেখানে নেই। “কোথায় গেল, নূরী কোথায় গেল” বলতেই রেজা সাহেবের পিয়ন সেলিম এসে জানালো আম্মাজান উপরে ঐ স্যারের কাছে গেছেন। স্যার তাড়াতাড়ি নিচে নেমে আসছিলেন, এই সময় আম্মাজান গিয়ে তাঁকে আটকিয়ে দিলেন, দেখে এলাম।

নূসরত জাহান নূরী সত্যিই উপরে এসে রেজা সাহেবের পাঞ্জাবিটা তখন টেনে ছিঁড়ে ফেলতে উদ্যত হয়েছিল। সেই সাথে সে বিপুল আক্রোশে বলছিলো— প্রতারক, ঠক, আমার সাথে এতো নাটক করলে কেন? তোমার এই পরিচয়টা একটুখানি প্রকাশ করতে যদি, তাহলে কি আমাদের শাদিটা বেঁধে থাকে এতদিন? এ নাটক করলে কেন? www.boighar.com

রেজা সাহেব শাস্তকর্ণে বললেন—নাটক করিনি নূরী। তোমাকে চিনে নেয়ার জন্যে এটা আমার প্রয়োজন ছিল। খামাখা উত্তেজিত হচ্ছে কেন? আগে ব্যাপারটা বুঝে নাও।

হাতে ধরা পাঞ্জাবির প্রান্তটা ছেড়ে দিয়ে নূরী বললো—চিনে নেয়া কি রকম? রেজা সাহেব বললেন—আমার সম্পদ দেখে আর খ্যাতি শুনে হাজারটা মেয়ে আমাকে শাদি করার জন্যে আজও এখানে একপায়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এদের নানাভাবে পরীক্ষা করে দেখেছি, এরা আমার ঐ সম্পদ আর খ্যাতির জন্যেই

আমাকে শাদি করতে চায়। সম্পদ খ্যাতিহীন সেরেফ একজন মানুষ আমির রেজাকে কেউ এরা শাদি করতে রাজি নয়। আমার চেহারা, আচরণ, আদব, আখলাক-এসবের কোন মূল্যই তাদের কাছে নেই। তাই তোমাকে পরীক্ষা করে দেখলাম, তুমি ঐ দলে কিনা? www.boighar.com

নূরী উদহীব হয়ে বললো—বটে! তা কি পেলো? পরম তৃপ্তি ভরে রেজা সাহেব হাসি মুখে বললেন—একটি নিখাদ রত্ন। যতটুকু মূল্যবান রত্ন আমি চেয়েছি, তার চেয়ে তুমি আমার হাজার গুণে অধিক মূল্যবান রত্ন।

চোখমুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো নূরীর। সে আবেগভরে বললো—পণ্ডিত!

রেজা সাহেব বললেন—এমন রত্ন এযাবৎ না পাওয়ার জন্যেই তো আমার শাদিটা আটকে আছে আজও। কিন্তু আর নয়—

—বলেই রেজা সাহেব হাসতে হাসতে নূরীকে জড়িয়ে ধরতে গেলেন। লাফ দিয়ে সামান্য একটু সরে দাঁড়িয়েই নূরী সশব্দে বলে উঠলো—আরে এই, এই বেগানা থার্ডপণ্ডিত, করো কি -করো কি!

—বলেই বিপুল বেগে হাসতে লাগলো নূসরাত জাহান নূরী।

এই সময় নূরীর খোঁজে নূরীর আব্বা ও মামা এসে হাজির হলেন সেখানে।

সমাপ্ত

www.boighar.com